পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা

দ্বিতীয় পর্ব

পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেকটার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৪২
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৪৪

প্রচ্ছদপট
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
এককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা জননী ও মাতৃষ্বসা

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

ও

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

শ্রীকরকমলেষু

গঙ্গেশ চক্রবর্তী

নিবেদন

এক সময়ে সুমেরু শিখরে ঋষিদের একটি সভা আহ্বান করা হয়। সভার আমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে এ কথাও প্রচার করা হয়, যে ঋষি ঐ সময় অনুপস্থিত থাকবেন, তিনি সাত রাত্রির মধ্যে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হবেন।

ঘটনাচক্রে ঋষি বৈশম্পায়ন সেই সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না। ঋষিবাক্য ব্যর্থ হলো না। এক অসতর্ক মুহূর্তে দৈববিড়ম্বনায় বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা করে বসলেন। দুশ্চিন্তায় অসহিষ্ণু হলেন ঋষি। বিচলিত হলেন শিষ্যবৃন্দরা।

অকস্মাৎ প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গর্বভরে বললেন, 'ভগবন্, আপনি আপনার অতি অযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন। আপনার আদেশ পেলে আমি একাই উগ্র তপস্যাবলে আপনার পাপের বিনাশ সাধন করতে পারি।' যাজ্ঞবল্ক্যের গর্বিত বচনে ক্রোধান্বিত হলেন ঋষি বৈশম্পায়ন। প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তুমি গর্বভরে তোমার সতীর্থদের বৃথা নিন্দা ও অপমান করছো। সুতরাং তোমাকে আমি যে বিদ্যাদান করেছি তা ফিরিয়ে দিয়ে এই মুহূর্তে আমার আশ্রম পরিত্যাগ করো।' শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অভিমানভরে সেই মুহূর্তে গুরুপ্রদত্ত বিদ্যা উদ্‌গিরণ করলেন। উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন তিত্তিরীপক্ষীর রূপধারণ করে তা ভক্ষণ করলেন। রক্ষিত হলো বেদবিদ্যা। রচিত হলো তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ঈশোপনিষৎ। বৈদিক উপনিষৎ প্রচারিত হলো লোকসমাজে।

আমি ঋষি বৈশম্পায়ন শিষ্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আনন্দময়ী মা'র অমৃত উদ্‌গিরণ রক্ষা করবার মানসে 'পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় পর্ব লোকসমাজে প্রচারে ব্রতী

হয়েছি। কাগজের দুর্মূল্যতা হেতু মূল গ্রন্থখানিকে দুইটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে

ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আনন্দময়ী মা যে অমৃত-নিষ্যন্দী বাণী দিয়েছিলেন আর উচ্চারণ করেছিলেন আত্মউদ্বোধনের সঞ্জীবনী মন্ত্র, 'ওঠো জাগো, যিনি ধ্রুব নিত্য ও সত্যস্বরূপ তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা করো।'—ব্রহ্মনিষ্ঠ সেই অমৃতময়ী বাণীসমূহ তাঁর সত্তার সঙ্গে, নিত্যধ্রুবনির্বিকল্পের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গে, চিরন্তনের সঙ্গে, রক্তধারার সঙ্গে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে। তাঁর জীবনই যে তাঁর বাণী। তিনিই জনয়িতা, রচয়িতা। যাঁর থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম। সমস্ত কিছুর যাত্রা। সমস্ত কিছুর ভূমিকা। আমার এই সাহিত্য-গ্রন্থখানি হচ্ছে তারই প্রতিচ্ছায়া। ক্ষুধা ও বঞ্চনার উর্ধ্বে যেন একটি সুধাময় অতলস্পর্শ তৃপ্তি। একটি অনির্বচনীয় প্রসন্নতা। সাহিত্যেই যে তাঁর সত্য পরিচয়, অবিকৃত কুলকীর্তি। সাহিত্যই হলো আমার পূজার মন্ত্র, আনন্দময়ীর পূজায় আনন্দমন্ত্র।

তত্ত্ববিদ্যারূপিণী আনন্দময়ী মা হলেন উপনিষদের সার। উপনিষৎ রচয়িতারা ছিলেন মহর্ষি, মহাযোগী, মহাকবি। আমি অজ্ঞ, অকিঞ্চন। পবিত্রতাও তো নেই। আছে শুধু কৃপা। করুণারূপিণী আনন্দময়ী মা'র অহৈতুকী কৃপা।

শ্রীশ্রীমা বলেন,—'যাঁহার সেবায় ব্রতী তিনি স্বয়ং-ই রক্ষক। সকলেই তো নিজ আপন আত্মা। পরম পথই পথ আর সব বিপথ। ভগবানই একমাত্র সত্য নিত্য।'

কলিকাতা
শুভ জন্মাষ্টমী

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

দ্বিতীয় পর্ব

এক

মা আনন্দময়ী চলেছেন কৈলাসে। তেরোশো চুয়াল্লিশ সালের তিরিশে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৩৭ খ্রীঃ) রবিবার। আলমোড়া থেকে শ্রীশ্রীমা যাত্রা করলেন কৈলাসের পথে। যাত্রাপথের সঙ্গী হলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ, অখণ্ডানন্দ স্বামী, ভাইজী, গুরুপ্রিয়া দেবী, দাসুবাবু, টুনু, কেশব সিং আর পাহাড়ী মেয়ে পার্বতী।

যাত্রা হলো শুরু। আলমোড়া থেকে বারছিনা। সেখান থেকে সন্ধ্যার পূর্বেই এসে পেঁাছালেন ধ্বলচিনা। ধ্বলচিনা থেকে সেরাঘাট। গণই। বেনিনাগ। বেনিয়ানাগ। থালা। ডেড়িঢাট পার হয়ে এসে পেঁাছুলেন আস্কোটে। আস্কটের রাজপরিবার শ্রীশ্রীমাকে ফুল ফল দিয়ে জগজ্জননী রূপে পূজা করলেন, এবং মায়ের থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

আবার যাত্রা হলো শুরু। চলার আর শেষ নেই। পথ অনেক দূর। অনেক দুরারোহ। নদী পেরিয়ে। পাহাড় ডিঙিয়ে। উপত্যকা ছাড়িয়ে,—দূর থেকে দূরে চলেছেন মা আনন্দময়ী। চারিদিকে কেবল গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌন ধ্যাননিমগ্ন পৃথিবী। কৈলাস যাত্রা নয়। এ যেন হিমালয় অভিযানে চলেছেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

হিমালয়। হিমাদ্রি। মহাহিমবন্ত। দেবতাত্মা হিমালয়। এ যেন গিরিরাজ হিমালয়ের আহ্বানে গিরিকন্যা ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছেন পিতৃসন্নিধানে।

দেবতাত্মা হিমালয়। বেদে। উপনিষদে। পুরাণে। মহাকাব্যে। ইতিহাসের পর্বে পর্বে তিনি পূজা পেয়ে এসেছেন। ভারতের পূজা। অন্তরের পূজা। মানব-হৃদয়ের পূজা।

এই আদি-অন্তহীন গিরিশৃঙ্গদলের আশেপাশে যুগযুগান্তকাল থেকে লক্ষ লক্ষ সংসার-বিরাগী সাধু-সন্ন্যাসী জীবন-বৈরাগী বাউল-তপস্বী জ্ঞানপিপাসু তীর্থবাসী। সত্যসন্ধানী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষ আপন আপন শান্তিনীড় করে গেছেন রচনা। মানুষের চিরবিস্ময় এই হিমালয়ের পাথরে পাথরে কত শত কাহিনী আজও রয়েছে চিহ্নিত। এই মহাপুণ্য গিরিমালার স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ করে গেছেন আর্য ঋষিগণ। সম্রাট অশোক। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর। মহাকবি কালিদাস। গৌতম বুদ্ধ। মহাবীর। শঙ্করাচার্য। স্বামী বিবেকানন্দ। আর আজ চলেছেন সরলা অবলা 'শাহবাগের সেই বউটি',—ঢাকার মা, শাহবাগের মা, বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।—

হিমালয়ের দুরারোহ দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে, দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্রের অভিমুখে। কৈলাসের পথে।

আবার যাত্রা হলো শুরু। বিহঙ্গ-কাকলীভরা ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম পেরিয়ে। দেওদারের বন ছাড়িয়ে। অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যলোক, অসংখ্য উপত্যকা, তার সঙ্গে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যাম বসন্ত শোভা, বন্য পার্বত্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ চলেছেন কৈলাসের পথে। ডাণ্ডিতে, ঘোড়ার পিঠে, কখনও আবার পদব্রজে। বালিয়া কোট, ধারচুল, পেরিয়ে মা এসে পৌঁছলেন খেলা'য়। এইখানেই পার্বত্য সন্ন্যাসিনী রুমাদেবীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমা'র প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়।

* * *

'দর্পণ পরিষ্কার করলে যেমন তাতে নিজের প্রতিমূর্তি পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হয়, তেমনি চিত্ত শুদ্ধ হলে আত্মস্বরূপ তাতে পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে। সেই ভাবে চিত্তশুদ্ধি লাভ করবার জন্য চেষ্টা কর। তাহাই লাভ করা দরকার।'

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বলছেন রুমাদেবীকে। রুমাদেবী একজন অসাধারণ সাধিকা। ত্যাগ ও সেবায় পবিত্র তাঁর জীবন। কৈলাসের কাছাকাছি দেশ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস'দেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

রুমাদেবী এসে সাক্ষাৎ করলেন আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে। প্রথম দর্শন। ব্রহ্মানুভূতির আনন্দ অনুভব করছেন অন্তরে। আনন্দ-বিহ্বলতা। অনির্বচনীয় আনন্দ। ঈশ্বরানন্দের অনুভূতিতে বিহ্বল হয়ে পড়লেন রুমাদেবী।

অবশেষে রুমাদেবী শ্রীশ্রীমা'কে সাক্ষাৎ ভগবতীরূপে করলেন পূজা। রুমাদেবীর সাধনায় হলো সিদ্ধিলাভ। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অহেতুকী কৃপা পেয়ে সাধিকা রুমাদেবী আনন্দের অমৃত-সাগরে করলেন অবগাহন।

রুমাদেবী বলছেন, "আনন্দময়ী মা'র রূপ ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিতাম যেন ঐ রূপ চলিয়া গেলো, তাহার স্থানে কখনও রামচন্দ্রের কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছে। মন ভাব-সমাধিতে ডুবিয়া যাইত কিন্তু তাহাতে আমার বাহিরের জ্ঞান লুপ্ত হইত না। অন্তরে কে যেন বলিত, 'সব রূপ দেখিয়া লও।' আর চলচ্চিত্রের ছায়ার মত একটার পর একটা রূপ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত। কখনও বা মনে হইত আমার কুণ্ডলিনী যেন ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতেছে। ধ্যানে মনে হইত যেন একজন মেয়ে আসিয়া আমার মস্তকে ফুল দিয়া আরতি করিতেছে। কখনও ধ্যান করিতে বসিয়া আমার শরীর দক্ষিণ এবং বামদিকে কম্পিত হইত। অন্তরে মনে হইত কে যেন বলিতেছে, সচ্চিদানন্দের আনন্দ লুটিয়া লও!"

"কখনও দেখিতাম আমার অন্তরে মা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তি একটার পর একটা প্রকাশ পাইতেছে। এবং কে যেন ভিতর হইতে বলিতেছে, 'দেখ দেখ, দেখিয়া লও।' কে যেন আনন্দময়ী মা'কে

দেখাইয়া বলিতেছে ইনিই রাম। কৃষ্ণ। ব্রহ্মা। বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। ইনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন।"

"কিছুদিন পর মা'র সঙ্গে হরিদ্বার হইয়া নর্মদা আসাব পথে, দিল্লীতে ট্রেন হইতে যমুনা দেখিয়া কৃষ্ণের ভাবে আমার মন এমনভাবে তন্ময় হইয়া গেলো যে আমি বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিলাম মা যেন কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চোখ দেখিয়া চিনিলাম, 'ইনিই মা'।

আমার শরীর অচল হইয়া গেলো। আমি বহুক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলাম।

আমি যখন মা'র কাছে থাকি তখন কেবলই মনে হয় মা মনুষ্য নয়, মা'র মুখে কৃষ্ণমূর্তি আর শরীরে দেবীমূর্তি।"

* * *

অবশেষে খেলা থেকে 'পঙ্গু', সিরখা, দীপ্তি, মালপা, বোধি অতিক্রম করে গারবিয়ানে এসে পৌঁছুলেন শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ।

গারবিয়ানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। চারিদিকটা যেন অসীম অনন্তের মূর্তরূপ। ভুবনমনোমোহিনী তুষার-কিরীটিনীব ধ্যানস্থ আত্মসমাহিত ভাব। আর বনে বনে ফুটে রয়েছে নানা রঙের ফুল। বর্ণের সুষমায় বন্য পার্বত্য প্রকৃতি অপরূপ হয়ে উঠেছে। 'এ যেন কৈলাসপতির সাজানো বাগান।' এই গারবিয়ানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু স্বামী জ্ঞানানন্দ, দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর, দাক্ষিণাত্যের একজন এঞ্জিনিয়ার আর স্থানীয় ধনী মানুষ নন্দরামবাবু ফল ফুল দিয়ে শ্রীশ্রীমা'কে জগজ্জননীরূপে পূজা করলেন।

তারপর আরও অনেক দুর্গম গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে, ভীষণ গহন অরণ্যানী পেরিয়ে, গিরিনদী নির্ঝরিণী ছাড়িয়ে, মানুষের চিরবিস্ময় হিমালয় হিমাদ্রি মহাহিমবন্তের পরমাশ্চর্য শোভা দেখতে দেখতে, লিপু, তাকলাকোট, পড়াও, রংগু ও গৌরী পাহাড়কে পিছনে ফেলে মা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দসহ এসে পৌঁছালেন মানস সরোবরের তীরে। মানস সরোবর। তুষারাচ্ছন্ন কৈলাস আর মন্দারের প্রত্যন্ত দেশে

সেই অনতিবিস্তার জলরাশি—পরবর্তী যুগে যার নাম হয়েছে মানস সরোবর। তুষারের পটভূমিতে যার হৃদয়ের উপর আজও ফোটে শ্বেত ও রক্তকমল।

মানস সরোবরের তীরে তাঁবু খাটানো হলো। কি স্থান! যেমন বিপদ-সঙ্কুল, তেমনই মনোরম। চারিদিকে নানা রঙের পর্বতমালায় সজ্জিত আর পাদদেশে সরোবর প্রবাহিত। এই সরোবরের জলে স্নান করেই ভাইজীর অবধূত ভাব হয়। অবধূত সন্ন্যাসীর ভাব। চীৎকার করে বলে ওঠেন পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি। মা, আমি সন্ন্যাসমন্ত্র পেয়ে গেছি। তারপর ছুটে এসে মায়ের চরণকমলে পড়ে গেলেন। ভাবে গদগদ হয়ে অনেকক্ষণ মায়ের চরণ আশ্রয় করে পড়ে রইলেন। অবশেষে গলার পৈতা, হার মায়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। এবং মৌন থাকবার ইচ্ছা মাকে জানালেন। মা আনন্দময়ী তখন তাঁর সন্ন্যাস নাম দিলেন 'মৌনানন্দ পর্বত'। ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র, ভাইজী—হলেন চিরসন্ন্যাসী মৌনানন্দ পর্বত। ভাইজীর সাধনায় হলো সিদ্ধিলাভ। অনির্বচনীয় আনন্দ পরম শান্তি অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে।

এই স্থানে ভোলানাথও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হতে সন্ন্যাসমন্ত্র নিয়ে তিব্বতানন্দ তীর্থ নাম গ্রহণ করেন।

* * *

আবার যাত্রা হলো শুরু। কৈলাসের পথে। তিন দিনের পথ। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন, 'ঐ যে—ঐ যে—কৈলাসের চূড়া।' কৈলাস পর্বত। ভক্তরা সকলেই অভিভূত হয়ে দেখতে লাগলেন কৈলাসের চূড়া। বরফের মন্দিরের মত চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠলো কৈলাস পর্বত। সাধু, সন্ন্যাসী, তপস্বী-তপস্বিনীর চিরবিস্ময়, হর-পার্বতীর তপস্যালোক—আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্র সেই কৈলাস। যোগতন্দ্রাচ্ছন্ন মহাদেবের জটাজটিল ধ্যানমৌন মহাস্থবির আত্মসমাহিত সেই অভাবনীয় মূর্তি নয়নগোচর

করে সত্যানুসন্ধানী মা আনন্দময়ী আর স্থির থাকতে পারলেন না। আশ্চর্য এক অনুভূতিতে হৃদয় তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। হঠাৎ ডাণ্ডি থেকে নেমে ব্যাকুল হয়ে ছুটতে লাগলেন কৈলাসের পথে। বিশ্বাস, ভাবনা ও তপস্যার আশ্রয় সেই কৈলাস পর্বতের দিকে। দুরতিক্রম্য শৈলশ্রেণীর ভিতর দিয়ে দুর্গম আর দারুণের দিকে ছুটে চলেছেন মা আনন্দময়ী উন্মাদিনীর মত। আলুলায়িত কেশ, হস্তে যষ্টি, শ্রীচরণে পাদুকা, বদন-কমল পরিশ্রমে রক্তাভ। ভক্তবৃন্দ মায়ের সেই এলোকেশী প্রলয়রূপিণী আর প্রেমতরঙ্গিণী মূর্তি নয়নগোচর করে মা—মা বলে চীৎকার করে উঠলেন। অবশেষে ভোলানাথ ও অন্যান্য সকলে ছুটে চললেন মায়ের পিছু পিছু। তারপর পাহাড়, নদী, উপত্যকা পেরিয়ে দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে—সভ্যতার সীমানা থেকে দূরে, অনেক দূরে, গৌরীকুণ্ডে এসে পৌঁছুলেন। কুণ্ডের তীরে তাঁবু ফেলা হলো। মা এখন অনেকটা শান্ত হয়েছেন। আত্মসমাহিত, ধ্যানস্থ। তপস্বিনী পার্বতীর ভাব।

এই গৌরীকুণ্ডেই সব কিছু করতে হয়। কৈলাস পর্বতে কোনও মন্দির নাই। দুর্গম স্থান। কৈলাস পর্বত প্রদক্ষিণ করাই কাজ। গৌরীকুণ্ডে স্নান করে ভাবানন্দে বিভোর হয়ে মা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দ সহ প্রদক্ষিণ করলেন কৈলাস পর্বত, আর দেখতে লাগলেন মানুষের অনন্ত বিস্ময় কৈলাস পর্বতের অপরূপ শোভা।

* * *

কৈলাস পর্বতের লীলা সাঙ্গ করে মা ভক্তবৃন্দসহ আবার যাত্রা করলেন আলমোড়ার পথে। মানস সরোবরের পথ ধরে নয়। অন্য পথে। এ পথও বিপদসঙ্কুল। দুর্গম শৈলশ্রেণী আর গভীর অরণ্যানীর ভিতর দিয়ে মা ফিরে চলেছেন ভক্তবৃন্দসহ। হঠাৎ পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র।

তারপর অনেক গ্রাম অনেক পাহাড় নদী উপত্যকা পেরিয়ে মা এসে পৌঁছুলেন খেলা'য়। উঠলেন এসে রুমাদেবীর 'সারদা

আশ্রমে'। রুমাদেবীও সঙ্গ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ভাইজী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সকলেই উদ্বিগ্ন।. তারপর দুস্তর গিরিশ্রেণী দুর্গম পথ অতিক্রম করে পঁচিশে শ্রাবণ মঙ্গলবার মা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দ সহ এসে পৌঁছালেন আলমোড়ায়। এখানে উঠলেন এসে নূতন একটি বাড়িতে। ভাইজীর চিকিৎসারও করা হলো সুবন্দোবস্ত। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা মা'কে দর্শন করতে আসছেন। লোকে লোকারণ্য। মা কিন্তু তখনও মৌন। বসে আছেন ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে। এ যেন জগতের জননী আজ ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের মা সেজে বসেছেন। লীলাময়ী মা লীলা করছেন ভক্ত সনে। ভক্ত ও ভগবানের লীলা হলো শুরু আলমোড়ার সেই নূতন বাড়িটিতে।

দুই

নির্মল আকাশে কোথা হতে ভেসে এলো ভীমকায় একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ। আচ্ছন্ন করে ফেললো সমস্ত পৃথিবীকে—রাহু যেমন গ্রাস করে প্রচণ্ড সূর্যকে।

১৩৪৪ সালের শ্রাবণ মাস সমাপ্তির দিকে,—ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ। সকলেরই চোখে জল। মা শুধু স্থির। ধীর। শান্ত। রাত্রি ১২টার পর অবস্থা যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, তখন মা রোগীর নিকট হতে উঠে নিজের খাটখানাতে বসলেন। ডাক্তার তাঁর শেষ চিকিৎসা আর একটা সেলাইন ইনজেকসন দিলেন। রোগীর জ্ঞান আছে। মৃদুস্বরে বললেন,—মা, কৈ? মা—মা। ভাইজীর সেই করুণ হৃদয়-বিদারক কণ্ঠস্বরে ভোলানাথ, হরিরাম, গুরুপ্রিয়া দেবী ও অন্যান্য ভক্তজনদের চোখ হয়ে উঠলো অশ্রুসিক্ত। মা ধীরে ধীরে উঠে আবার রোগীর শয্যাপার্শ্বে এসে বসলেন। মাথার

তালুতে হাত দিলেন। রোগীও হলেন শান্ত। এ যেন মাতৃহারা শিশু ফিরে পেলো তার মাকে।

অবশেষে সত্যসত্যই সেই ভীষণ দিনটি হলো উপস্থিত। ১৩৪৪ সালের ২রা ভাদ্র বুধবার, ইং ১৯৩৭ সাল। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে সন্তানবৎসলা মা আনন্দময়ী ও ভক্তবৃন্দ শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিত হৃদয়ে মহা সমাধির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে জীর্ণ পিঞ্জর ছেড়ে মহান আত্মা মহাকাশে বিলীন হবার জন্য যেন পাখা মেলে দিলো। নাসাগ্র-নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির, বদন মৃদু হাস্যে অনুরঞ্জিত!

একটি পরম ভাগবত জীবনের হলো অবসান। একটি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়লো যেন মহামায়ার হৃদয়াকাশ হতে।

ভোলানাথ বলছেন, "শেষ সময় পর্যন্ত জ্যোতিষের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর একটু পূর্বে আমাকে বললো, 'বাবা দেখলেন তো, এই সংসারে কেহ কারো নয়। একমাত্র শ্রীশ্রীমাই সত্য। তারপর 'মা—'মা'—বলে প্রণব উচ্চারণ করলো। হরিরামকে ডেকে বললো—We are all one। মা, আমি এক। বাবা, আমি এক। তারপর মা—মা—ডাকতে ডাকতে লীলা সাঙ্গ হলো।"

একজন ভক্ত লিখছেন, "দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে ভাইজী আমাদের একজনকে ডেকে লিখে রাখতে বললেন, 'আমরা সকলেই এক।' 'মাকে যে অন্তরে বাইরে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। কি আনন্দ! কি সুন্দর'?"

গুরুপ্রিয়া দেবীর ভাষায়, "রোগীর অবস্থা ভয়ানক। আমরা কাঁদিতেছি। দাদা (ভাইজী) মৃদুস্বরে বলিতেছেন, 'খুকুনী—নাম শুনাও।' আমি চোখের জল মুছিয়া মা নাম শুনালাম। একটু পরে বলিতেছেন, কি সুন্দর! আবার বললেন, খুকুনি—কি সুন্দর! একটু পরে আবার এক অঙ্গুলি উঠাইয়া বলিলেন, 'সব এক। এক ছাড়া কিছুই নাই।' হরিরাম কাঁদিয়া বলিল, ভাইজী! প্রত্যুত্তরে বললেন, 'এক কথা খেয়াল রাখ না ভাই, এক—সব এক।' আমি

বলিলাম—দাদা বেশ মা'র কোলে শুইয়া আছেন। বলিলেন, 'মা ও আমি এক। বাবা ও আমি এক। আমরা সবাই এক। এক ছাড়া কিছুই নাই।' পরে সন্ন্যাসমন্ত্র স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলেন। জোরে জোরে শ্বাস পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে শব্দ বন্ধ হইল। মা'র দৃষ্টিতে ও কৃপার ভিতর থাকিয়া ধীরে ধীরে মহাপুরুষ ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগের ২।১ মিনিট পূর্বে আমি খাট হইতে নামাইয়া লইলাম। মা'র চরণ মাথায় দিলাম। বালিশে মা'র পা ছোঁয়াইয়া রাখিলাম। মা চুপ করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। আত্মসমাহিত। ধ্যানস্থ।

আমি সকলকে বলিলাম 'মা নাম শুনাও'—তাহা আরম্ভ করিতেই শেষ নিঃশ্বাস পড়িল।"

মা বলছেন, 'এই ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত নয়। আমি ও তোমাদের ভাইজী উহা পূর্বেই জানতাম। সে ফিরিবার পথে আমায় বলেছিলো, আলমোড়াতে তার দেহপাত হতে পারে! তাকে সন্ন্যাস দেবার জন্য কৈলাসে আমার নিকট সে প্রার্থনা জানিয়েছিলো, যেন সংসারের সকল বন্ধন হতে সে মুক্তিলাভ করতে পারে। তার এই স্থানে দেহত্যাগের কারণ এই যে তার পূর্ব জীবনের সহিত এই স্থানের ও এখানকার লোকেদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।'

* * *

মা আনন্দময়ী ও ভক্তবৃন্দের হৃদয় বিচলিত হলো ভাইজীর বিয়োগব্যথায়। নয়নে নয়নে অঝোরে বইতে লাগলো শ্রাবণের ধারা। বিশ্বপ্রকৃতিও যেন বিরাট পুরুষের বিয়োগ-ব্যথায় হয়ে উঠলো আকুল।

তিন

ভক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পরদিন মা' হলেন সমাধিস্থ। দীর্ঘ ছয়দিন পর্যন্ত এই অবস্থায় রইলেন একই ভাবে। শ্রীশ্রীমায়ের সেই অনির্বচনীয় ভাবঘন মূর্তি নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন ভক্ত-বৃন্দ। আর অভিভূত হলেন একজন বিদেশিনী। ফরাসী মহিলা মিসেস পেন্টরোজ। মা'কে দর্শন করছেন আর অশ্রুধারায় হচ্ছেন অভিষিক্ত। জীবনে যা দেখেন নাই তাই আজ দেখছেন। বিশ্বজননীর প্রকাশ মূর্তির দর্শন হলো। দৃষ্টি স্থির। শান্ত। স্নিগ্ধ। শরীরের নড়চড় নাই। অলৌকিক ভাবে পূর্ণ মাতৃমূর্তি। যাঁর চিরকল্যাণময়ী জীবনের স্পন্দনে শুষ্কপ্রাণও হয়ে ওঠে মঞ্জরিত। যাঁর স্বতঃ-উদগত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অলক্ষ্যে অধ্যাত্মপথে মানুষের চিত্তগতি নানাদিকে হয় প্রসারিত। সেই জ্যোর্তিময়ী মহাভাবময়ী বিশ্বজননীর মূর্তি দর্শন করে অভিভূত হলেন মিসেস পেন্টরোজ।

পরে তিনি ভক্তপ্রবর হরিরামকে বলেছিলেন, "আমি অনেক সাধু দেখিয়াছি, কিন্তু মা'র মত এমন পূর্ণভাব আর কোথাও দেখি নাই। আমি যখন আলমোড়াতে মা'র সমাধি অবস্থায় মা'র কাছে বসিয়াছিলাম, তখন দেখিতেছিলাম মা'র শরীরটা যেন একটা বিরাট আকার ধারণ করিল। আমি ভাবিলাম, হয়ত আমার দেখিবার ভুল হইতেছে। এই ভাবিয়া চক্ষু রগড়াইয়াও দেখি সেইরূপ। কিছু সময় পরে মা'র শরীর হইতে সূর্যকিরণের মত একটা জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহা শান্ত হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ করিল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। পরে মা আমার দিকে চাহিলেন, আমিও চাহিলাম। এবং তখন আমি শান্ত হইলাম। অনেক লোকের ভিড় ছিল। এর পরে আমার অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি মনে করি মা'ই 'পরাজ্ঞান'। তিনি আমাকে যে আদেশ করেন আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।

আমি আরও দেখিলাম মা বিরাট মূর্তিতে হাত পাতিয়া বসিয়া সকলকে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন, 'তোরা বাহিরে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস ? আমার ভিতর আয়, অন্তর রাজ্যে প্রবেশ কর্' ।"

*   *   *

ধর্মের পথে যেতে হলে আগে চাই দীক্ষা। কিন্তু সবার পক্ষে এ পথ সময়-উপযোগী বিবেচিত না হতে পারে। তবে কি আর কোন পথ নেই ? পথ আছে। সে হলো সাধনা। তাঁকে পাবার আশায় সাধনা করে যাও। সব মীমাংসা তিনি হৃদয়ে ফুটিয়ে দেবেন।

মা বলছেন ভক্তবৃন্দকে। বিষ্ণু মন্দিরে। নর্মদা-তীরবর্তী চান্দোদের বিষ্ণু মন্দিরে। বেশ বড় মন্দির। একজন মোহন্ত ও কয়েকজন সেবায়েৎ আছেন। মন্দিরসংলগ্ন প্রকোষ্ঠটি মা'কে ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামী অসীমানন্দের পরিচিত স্থান। তিনিই নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে আছেন রুমাদেবী, গুরুপ্রিয়াদেবী, ভক্তপ্রবর হরিরাম যোশী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ।

মা ভক্তবৃন্দসহ নর্মদায় স্নান করে বিষ্ণু মন্দিরে এসে বসেছেন। ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে শুনছেন মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী।

মা আবার বলছেন, এই জন্যই আমি প্রথম হতে সকলকে বলি, যার যে নাম ভাল লাগে সে তাই করতে থাক। গুরুর আদেশ বিনা বাক্যে পালন করে যাও। নিজেকে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ছেড়ে দাও। নিজের কোন ইচ্ছাই বড় করে তুলো না। দেখবে আপনা হতে সব ফুটে উঠবে। কলিযুগে সরল সোজা নাম সাধনেই সব হয় ইহাও তো কথা আছে। তোমরা ভেবো না যে সংস্কৃত শব্দে দীক্ষা না হলে ভগবানকে ডাকা যাবে না এবং কোন কাজ হবে না। এ শরীরকেও তো দেখছো এবং কত কথা শুনছো। ইহাই কি কেবল কথা ? দরকার মত সব নিজে নিজেই এসে যাবে। বলেছি ত রেজেস্ট্রি খাতায় নাম লিখাতে হলে ভাল নাম চাই। তোমার যে নাম ভাল লাগে করে যাও। দরকার মত সব এসে যাবে। 'বীজ' অর্থ বিশেষ পরিচয়।

যেমন তোমার জানা আর কিছু পরিচয় জানা নেই। কিন্তু নাম ধরে ডাকলেই কাছে আসলে তার সব পরিচয়ই পাওয়া যায়।

নামের মধ্যেই বীজ আছে। তাই নাম করতে করতে বীজ স্ফুরিত হয়। বীজের মধ্যেও নাম আছে। সবার মধ্যেই সব।

তাই নামের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগ বাড়াও। শুধু একটা অভ্যস্ত নিষ্প্রাণ বুলি নয়, একটা প্রজ্বলন্ত প্রেম মন্ত্র। যাকে ভালবাসি তাকে যেন হৃদয়ের স্বর দিয়ে ডাকা। সে ডাকের সংঘর্ষে বাতাস হবে সমীরিত। আর সঞ্জীবিত হবে গেই নিরুত্তর নির্মম প্রস্তর। আর তারই প্রত্যুত্তর একদিন পুষ্পায়িত হবে সেই প্রস্তরে।

অনুরাগ নিয়ে কথা। মাটি যত শক্তই হোক যদি অনুরাগের বর্ষণ থাকে তবে নাম-বীজের অঙ্কুর যতই হোক কোমল, মাটি ভেদ করে ঠিক উঠবে।

আবার মা বলছেন, অবতারদের মধ্যে ভাবের খেলা সম্বন্ধে।

এক হিসাবে ত সকলেই অবতার। আব যদি তা ছেড়ে দাও, তবে কোন্‌খান হতে অবতরণ হয়? উত্তরে বলা যায় নির্গুণ ও সগুণের প্রকাশ। সগুণ ও নির্গুণের যুগপৎ প্রকাশই অবতার। যেমন গাছের অঙ্কুর। সেই অঙ্কুর হতেই গাছপালা হয়। অঙ্কুরাবস্থায় কিন্তু গাছের রং ও প্রকৃতি ধরা যায় না। বীজ মাটির সঙ্গে মিলে থাকলে অঙ্কুর জন্মে। এবং ক্রমে ক্রমে তা হতে গাছপালা ও ফুল ফল বের হয়। সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের যুগপৎ প্রকাশ হতেই অবতার। তাই অবতারের মধ্যে দুই ভাবেরই খেলা দেখা যায়।

আবার দেখ সমুদ্রের উপরের অংশটা কেমন তরঙ্গময়। কিন্তু ভিতরের অংশে সে তরঙ্গ নাই। প্রশান্ত গম্ভীর। সেইরূপ অবতারের মধ্যে চল ও অচল দুই ভাবেরই খেলা চলে।

এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো নর্মদাতীরের বিষ্ণু মন্দিরে। দিবা অবসান হলো। নিঃশব্দে নেমে এলো সন্ধ্যা। নর্মদা-তীরের মন্দিরগুলিতে শুরু হলো সন্ধ্যা-আরতি। আলোয় আলোকময়

হয়ে উঠলো মন্দিরগুলি। ধীরে বয়ে চলেছে নর্মদা। যেন ছেদহীন একটি মাত্র চিন্তার ধারা। কোন তরঙ্গ নাই। কোন বিক্ষোভ নাই। শান্ত। স্নেহ-মসৃণ।

নর্মদার চলমান জলধারার সঙ্গে মা আনন্দময়ীও ভক্তবৃন্দ সহ ভেসে চলেছেন নৌকা করে। মনে হয় নদীর গতির সঙ্গে শ্রীশ্রীমাও যেন এক হয়ে মিশে গেছেন। কোন ভাবনা নাই। কোন বেদনা নাই। কোন বাধা নাই। চিরমুক্ত। নিত্যপ্রবহমান।......

নদীর জল-মর্মরে মা শুনতে পান কৃষ্ণের বাঁশীর সেই মর্মভেদী সুর। ভাবানন্দময়ী মা গান ধরলেন ঃ

হরিনামের তরী বাঁধ ভাই,
দেখ গগনে আর বেলা নাই॥

মাতৃকণ্ঠের সঙ্গীতে ভরে গেলো শূন্য দিগঙ্গন। আনন্দ···আনন্দ ···আনন্দ···আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই বিশ্বভুবনে। ওগো মহানন্দ। অনন্ত। অপার।···

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে চলে গেলো। অবশেষে নৌকা এসে লাগলো এক আশ্রমের ঘাটে। মা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দসহ আশ্রম দর্শনে এলেন। মোহন্ত এসে মা'কে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন। মোহন্তের নাম কৈলাসানন্দ। তাঁর গুরু কেশবানন্দ। আর কেশবানন্দের গুরু ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দই দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরু। বালানন্দ ব্রহ্মচারী এখানে প্রায় ৫০ বৎসর ব্রহ্মচারী জীবন অতিবাহিত করেছেন। আশ্রমে আছে শিব মন্দির। এখানে আশ্রমকে বলে কুটিয়া। তারপর মা এলেন নর্মদেশ্বরীর মন্দির দর্শনে। এই ভাবে বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ নর্মদা তীরের কুটিয়া আর মন্দিরাদি দর্শন করে আবার ফিরে এলেন বিষ্ণু মন্দিরে।

ব্যাস তীর্থ। ব্যাসদেবের তপস্যার স্থান। নর্মদার একদিকে ব্যাস অপরদিকে শুকদেব। পরম পবিত্র ভূমি। নির্জন স্থান। দ্বীপের মধ্যে কয়েকটি মন্দির ও আশ্রম আছে। মা ব্যাস তীর্থে

স্নান করে ব্যাস-স্ত্রী অনসূয়া দেবীর মন্দির দর্শন করলেন। কত তীর্থ। কত আশ্রম। কত মন্দির। তীর্থে তীর্থে আশ্রমে আশ্রমে মন্দিরে মন্দিরে মা পরিভ্রমণ করছেন।

ব্রহ্মচারী রামনলালজী শ্রীশ্রীমায়ের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, 'মা মাগো, তুমিই জগজ্জননী। তীর্থস্থানরাও সাধু মহাত্মাদের দর্শন প্রার্থনা করেন, অতএব তুমি একটু নর্মদার তীরে তীরে ভ্রমণ করে সকলের উপর কৃপাদৃষ্টি দিও।'

* * *

'বাপ, মা, স্বামী, শিক্ষক, এমন কি যাঁর নিকট হতে কোন একটি বিষয় জানতে পেরেছ, সকলেই ত গুরু। সব কাজের জন্যই একটা উপলক্ষ্য চাই, যে কোন জ্ঞান লাভ করতে চাও গুরুর প্রয়োজন।'

আবার বলছেন, 'কর্ম না করলে কিছুই হবে না। কর্ম করা চাই। অশুদ্ধ বন্ধন কাটাতে হলে শুদ্ধ বন্ধনে পড়তে হয়। যেমন কাপড়ে গেরো দিয়েছো, সেটি খুলতে হলে তার মধ্যে মনঃসংযোগ করে হাত দিয়ে খুলতে হবে। সব কাজই এই রকম।'

মা বলছেন ভক্তিমতী গুজরাটী মহিলাদের। আমেদাবাদে। ভক্তবৃন্দ সহ মা এসেছেন আমেদাবাদে। উঠেছেন ধর্মশালায়। বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। ভক্তিমতী গুজরাটী মেয়েরা মা'কে ছাড়তে চাইছেন না। প্রাণহরা মা অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন। মা'র সহজ সরল উপদেশ বাণী সকলকেই করেছে মুগ্ধ। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকেরা মা'র উপদেশ-বাণী গুজরাটী ভাষায় ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন।

ভক্তিমতী একটি পার্শি মেয়ে মা'কে জিগ্‌গেস করলেন, 'মাতাজী, আমার কোনরূপ প্রতীক উপাসনা ভাল লাগে না। আমার মন স্থির করবার উপায় কি?'

মা তৃপ্তিকর ভাষায় উত্তর দিলেন, 'বেশ, তুমি শান্তভাবে বসে যে

শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, তা লক্ষ্য করতে থাক। আর কিছু করবার প্রয়োজন নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসই তোমার প্রতীক।'

মা'র উত্তরে আনন্দিত হয়ে মেয়েটি মা'কে সাক্ষাৎ দেবী বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। এইভাবে যাঁরা মায়ের ভাষা পর্যন্ত বোঝেন না তাঁরাও মায়ের মুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শুনে আর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ছেন। স্ত্রী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই। সকলেই বলছেন, 'আমরা মা'কে দর্শন করে ধন্য হলাম।'

প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুত কান্তিলাল, রতিলাল, অম্বাশঙ্কর বৈদ্যরাজ প্রভৃতি সকলেই আজ মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েছেন। জ্যোতির্ময়ী মাতৃ-মূর্তি আর মায়ের উপদেশ-বাণী তাঁদের চিত্ত জয় করে নিয়েছে।

একজন ভক্ত জিগ্‌গেস করছেন, মা, পূর্বজন্ম আছে কি?

মা বললেন, আছে। তবে যাদের পূর্বজন্ম ও পরজন্ম সংস্কার আছে, তাদেরই জন্মান্তর হয়। যাদের নাই তাদের হয় না। যে যে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে তার সেইরূপ ভাবই জাগে। সে সেইরূপ কথাই বলে।

ভক্তটি প্রত্যুত্তরে বলছেন, তা'হলে ত মুসলমান কি খ্রীষ্টান হওয়া খুব ভাল। তাদের জন্মান্তর সংস্কার নাই অতএব তাদের আর জন্ম হবে না। আর আমরা—আমাদের কত জন্ম যে যাওয়া আসা করতে হবে তা নির্ণয় করা অসাধ্য।

উত্তরে মা বলছেন, তুমি ইচ্ছা করলেই কি শুধু এই ভাবটুকু নিয়ে সংস্কারমুক্ত হতে পারো? তোমার সংস্কার যে জন্মগত। আর দেখ, শুধু হিন্দু বা মুসলমান হলেই হয় না। কত মুসলমানের হিন্দু সংস্কার থাকে, আবার কত হিন্দুর মুসলমান সংস্কার থাকে।

ভক্তটি আবার জিগ্‌গেস করছেন, দর্শনাদি হয় কি না এবং হলে উহা ঠিক কি না?

মা প্রত্যুত্তরে বলছেন, নিশ্চয়ই হয়। যেমন তোমাকে দেখছি ঠিক সেই রকম দেখা যায়।

আবার বলছেন ভক্তটি, লোকে বলে ব্রহ্ম অজ্ঞেয় অব্যক্ত। যদি তাই হয় তবে তাঁকে জানা যায় কিরূপে?

মা তৃপ্তিকর ভাষায় উত্তর দিচ্ছেন, তুমি একটি ফুল দেখেছো। আমি জিগ্‌গেস করলাম—'বাবা ফুলটা কি রকম? তুমি বললে, 'খুব সুন্দর, ফুলটি এই রকম। এই রকম। ইত্যাদি।' কিন্তু ফুলের যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা হলো কি? তোমার মনের ভাব ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারলে কি? তুমি ভাষায় কোন বস্তুরই স্বরূপ পরিচয় দিতে পার না। একটু আভাস মাত্র দিতে পার। কারণ বাণী সেখানে কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই-ই। সেইরূপ ব্রহ্মও ব্যক্ত ও অব্যক্ত। জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়—যুগপৎ দুই-ই। সব ভাবই তাতে আছে। এই বলে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমায়ের হাস্যের উচ্ছলতায় বিষয়টা রস ও রহস্যে হয়ে উঠলো ভরপুর।

মায়ের যুক্তিপূর্ণ উত্তরে ভক্তটির মনের সংশয় দূর হলো। আনন্দিত চিত্তে তিনি জগজ্জননী বলে শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

সন্ধ্যা নেমে এলো। মা সুমিষ্ট কণ্ঠে গান শুরু করলেন ঃ

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম।
জয়তু শিব শিব জানকী রাম,
জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম॥

শ্রীশ্রীমায়ের মধুর কণ্ঠস্বর সকলের মর্ম স্পর্শ করলো। সকলে সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগলো। ধর্মশালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কীর্তনে যোগ দিল। ভক্ত অধ্যাপক নরেশবাবু, অধ্যাপক শচীবাবু, অধ্যাপক নরেনবাবু, ভোলানাথ সকলেই নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন। স্থানীয় ভক্তরাও কীর্তনে মেতে উঠলেন। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য।

এই ভাবে আমেদাবাদের লীলা সাঙ্গ করে মা এলেন ডাকুরে।

এসে উঠলেন বল্লভ-ভবন ধর্মশালায়। তারপর গোমতীতে (প্রকাণ্ড সরোবর) স্নান করে দর্শন করলেন 'রণছোড়-রায়জী' (বিষ্ণু মন্দির)। প্রবাদ এই যে দ্বারকানাথ এখানেই আছেন। এখন যে মূর্তি দ্বারকায় আছে তা পরের মূর্তি। প্রাচীন মূর্তি ইহাই।

ডাকুর থেকে মা এলেন বরোদায়। দর্শন করলেন শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। মন্দিরের স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তিরূপে নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন এবং হৃদয়াপ্লুত শ্রদ্ধায় নমস্কার করে বললেন, 'মা, তোমার চেহারা দেখেই মনে হয় তুমি পূর্ণতৃপ্ত হয়ে আছ, তবুও এখানে সকলকে নিয়ে একটু প্রসাদ পেয়ে গেলে আমরা কৃতার্থ হতাম।'

মা অমনি স্বাভাবিক মধুর হাসি হেসে বললেন, 'বাবার দেখা পেয়েছি, বাবার মুখে সৎকথা শুনেছি ইহাই ত প্রসাদ।'

স্বামীজী প্রত্যুত্তরে বললেন,—ব্যবহারিক ভাবে তোমাকে একথা বলছি। অবশেষে অন্নকূটের (ঠাকুরের ভোগ) পর নামগান শুরু হলো। মা'ও ভক্তবৃন্দসহ কৃষ্ণ কীর্তনে মাতলেন। ভাবানন্দময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে স্থানীয় লোকেরা মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। এবং জগজ্জননীরূপে সকলেই প্রণাম করলেন মা আনন্দময়ীকে। বরোদার শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরও প্লাবিত হয়ে উঠলো মা আনন্দময়ীর আগমনে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

এইভাবে বরোদার লীলা সাঙ্গ করে লীলাময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ আবার ফিরে এলেন নর্মদাতীরের তীর্থে। কর্ণালীতে। দুই একদিনের পরিচয়েই স্থানীয় ভক্তরা মা'কে সেবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ফল মিষ্টি দিয়ে মা'কে দর্শন করছেন আর 'মা নর্মদে! মা মহেশ্বরী!' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

একজন ভক্ত অভিভূত হয়ে বলছেন, 'মা, কত মহাপুরুষের জীবনী পড়েছি। দেখেছি। কিন্তু এমন আর দেখি নাই। শুনি নাই।

তুমি যে কি তা বোঝা আমাদের সাধ্য নাই। তোমাকে কোন দেব-দেবী বললেও ছোট করা হয়।'

নর্মদার ওপারে আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। পরিপূর্ণ, আলো-ঝলমল। নদীর উপরে ম্লান কুয়াশা চাঁদের আলোয় হয়ে উঠেছে রূপালী। আকাশে নক্ষত্রের আলোক স্পন্দনের উত্তরে মাটিতে পতঙ্গরা অবিরাম গুঞ্জন করে চলেছে। পতঙ্গের গুঞ্জন নয়। সঙ্গীতের সুর। নদীর ধারে ভগবানের নাট্যশালা হতে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে সঙ্গীতের সুমধুর সুর। রাত্রির এই মহাসঙ্গীতের সুবিশাল জলসায় দূর নক্ষত্রের আলোক স্পন্দন হতে অন্ধকারে পল্লবের মৃদু পত্র মর্মর পর্যন্ত কত না বিচিত্র তন্ত্রীতে নিত্য উঠছে কত না বিচিত্র সুর। নর্মদার তীরে ভগবানের সেই নাট্যশালায় বসে মা আনন্দময়ী সুমিষ্ট কণ্ঠে গান ধরলেন ঃ

—আমি কি তার সঙ্গ ছাড়া হই—
যে জন কাতর প্রাণে ডাকে আমায় মা কই মা কই ?
হৃদয়ে জাগায়ে তাঁরে, নামে প্রাণ মাখা থাকে,
আর কিছু না দেখে চোখ, এ ব্রহ্মাণ্ডে আমা বই।
অন্য কথা কয় না মুখে, ব্যথিত হয় সে ব্যথিত দেখে।
সমান থাকে সুখে দুঃখে, লোকের নিন্দা শোনে কই ?
শিশু যেমন মাকে ডাকে, মা ডাকে তার আঁখি ঝরে,
পারি কি আর থাকতে দূরে, অমনি এসে কোলে লই।
আমি কি তার সঙ্গ ছাড়া হই—

চার

শান্তি কিসে হয়?

দূর অন্ত হলেই শান্ত হয়। সংসারে কারও কখনও শান্তি হয় না। সংসার! সং-কে সার করলে কখনও শান্তি হতে পারে? বিষয়—বিষ হয়। অর্থাৎ যেখানে বিষ উৎপন্ন হয়। বাসনা মানে সংসার। সংসার মানে দুঃখ। জগৎ-গতাগতিতে সুখ হয় না। পরম সুখ অনুসন্ধান মনুষ্যের কর্তব্য। অর্থাৎ সত্য অনুসন্ধান। ঈশ্বর চিন্তায়ই একমাত্র শান্তির আশা।

মা বলছেন ভক্ত কুমুদ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। কাশীতে। নর্মদা থেকে মা ফিরে এসেছেন কাশীতে। উঠেছেন ধর্মশালায়। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। ভক্তরা মনের সংশয় দূর করবার জন্য প্রশ্ন করছেন। মা হাসি হাসি মুখে তৃপ্তিকর ভাষায় উত্তর দিচ্ছেন। ভক্ত কুমুদবাবু শান্তি পাওয়ার কথা তুলেছেন, তারই উত্তরে শ্রীশ্রীমা সুন্দর করে, সহজ করে শান্তি পাওয়ার পথের নির্দেশ দিলেন। মা আবার কাব্যায়িত করে তৃপ্তিকর ভাষায় ভক্তদের বোঝাচ্ছেন কৃষ্ণতত্ত্ব।

দেখ ত'—গরু ত পশু। পশু কি? না পশুর বৃত্তি। সেই বৃত্তিগুলির রক্ষক রাখাল কি করে? গরুগুলিকে রক্ষা করে যাতে তাদের নিকট হতে দুধ পাওয়া যায় তারই চেষ্টা করে। দুধ হলো শুভ্র বর্ণ। শুভ্র বর্ণ হলো কি—না, সত্ত্বগুণ। বৃত্তিগুলিকে সেই রকম ভাবে রক্ষা করতে হয়। যাতে তা হতে সত্ত্বগুণ বের হয়। তারপর মন্থন করে সত্ত্বের সার বস্তু মাখন উঠল। সেই মাখনের পরিণতি কোথায়? পরমাত্মায়। তাই মাখন চোর কৃষ্ণ। এখন পরমাত্মাকে 'তুমি তুমিই' বল—'আমি আমিই' বল, একই কথা।

আবার দেখ গোপিনীরা ছিলেন। তাঁরা কে? দশ ইন্দ্রিয়, ছয় রিপু, এই ষোল। ষোলর উপর যে সত্য, স্বরূপ, সেই যে এক রস ধর না, সেই রসই ঋষি নামে কথিত। ঋষিরা কি করলেন? রাম অবতারে, রামের কাছে গিয়ে তাঁকে পতি ভাবে কামনা করলেন। রাম বললেন, 'এখন নয়। কৃষ্ণ অবতারে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। সেই এক রস গিয়ে যখন রামের কাছে দাঁড়ালো মিলন রসের জন্য, তখন আকর্ষণ ব্যতীত সেই রসের পরিণতি হয় না বলে, রামের কাছে গিয়ে পতিভাবে কামনা করলো। রাম বললেন, 'কৃষ্ণ আসলে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে।' কৃষ্ণ কি? না—আকর্ষণ। রামের কাছে গেলেই আকর্ষণ আসবেই। তাই রামকে পতিভাবে চাওয়ার কথা আসলো। তারপর দ্বাপরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যখন কৃষ্ণ আসলেন তখনই লীলা আরম্ভ হলো। কারণ সেই রসই লীলার অধিকারী কি না! তাই কাত্যায়নী পূজা করে পূজ্য পূজকের সীমা অতিক্রম করে লীলার অধিকারী হয়। লীলা নিত্য বলা হয়। সত্যই লীলা কিন্তু নিত্য। নিত্যকাল ধরে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যামৃত আস্বাদ করছেন। আর এই লীলায় যোগ দিল কারা? না—গোপিনীরা। গোপিনী কি? না,—সেই এক রস। ঋষিরাই গোপিনী হয়েছিল। এ হলো অতীন্দ্রিয়ের বিষয়। তাই জাগতিক ভাবে তা ধরতে পারা যায় না। এই প্রাকৃতিক বিষয় ভাব হতে সেই অপ্রাকৃত খেলা। লীলারস গোপন কিনা তাই গোপিনী নামে কথিত ও সেই রসে অধিকারী।

আবার দেখ বাইরের দিক হতে দেখলে গরু রক্ষা করে গোপেরা। গোপ নাম হলো কেন?—না দুধের মধ্যে মাখন গুপ্তভাবে থাকে তা ত সাধারণ ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। এই মাখন অর্থাৎ গুপ্ত জিনিস বের করে বলে তারা গোপ।

কঠিন তত্ত্বকথা মা সরল সুন্দর করে ভক্তদের বলে শিশুর মত হাসতে হাসতে বললেন, 'এই একদিক [illegible] এলোমেলো [illegible] খেয়ালে
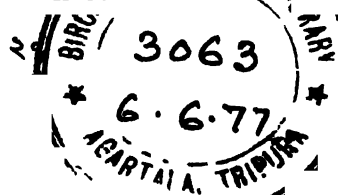
এল বললাম।’ সরল হাসির উচ্ছলতায় বিষয়টি রস ও রহস্যে হয়ে উঠলো ভরপুর।

*　　　　*　　　　*

শ্রীশ্রীমা এখন হরিদ্বারে। দেহ অসুস্থ। রক্তশূন্যতা। শরীর খুবই দুর্বল। কুম্ভস্নান উপলক্ষ্যে এসেছেন। উঠেছেন ঠাকুরদাস বদ্রিদাস ধর্মশালায়। ধর্মশালাটি ভীমগোড়ার এক মাইল উপরে হৃষীকেশের রাস্তার ধারে।

ভোলানাথ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ভক্তবৃন্দও নিরানন্দ। আনন্দের আধার মা আনন্দময়ী কিন্তু রঙ্গরস দ্বারা সকলের মনে আনন্দ সঞ্চার করতে চেষ্টা করছেন। ভক্তপ্রবর ডাক্তার পীতাম্বর পন্থ চিকিৎসা করছেন। তিনি বলছেন, ‘মা, এমন রুগী আমি আর জীবনে পাই নাই। আমার ঔষধে কিছু হবে না। আপনার শরীরের চিকিৎসার আমি কি করবো? আপনি নিজে সুস্থ হবার ইচ্ছা করুন। এই আমার প্রার্থনা।’

মা মৃদু হেসে বললেন, ওষুধ যখন খেয়েছি তখন রোগীর সব লক্ষণই প্রকাশ পাওয়া চাই ত? তাই ওষুধ খাওয়ার পরই শয্যা নিতে হয়েছে। ইহা ত হইবেই। যা হইবে পূর্ণ ভাবেই হওয়া চাই ত।

ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা’র শরীরে অস্বাভাবিক যৌগিক ক্রিয়া আরম্ভ হলো। ঔষধে জ্বর বন্ধ হলো সত্য কিন্তু আবার আরম্ভ হলো হৃৎকম্প।

ডাক্তার পন্থ বললেন, ‘মা, আপনার ত সাধারণ মনুষ্য শরীর নয়। এই শরীরে কি ভাবে ঔষধ দেব আমি ঠিক পাচ্ছি না। আপনি নিজের ভিতর আরোগ্য ভাব না আনলে আমরা কিছুই করতে পারবো না।’

মা মৃদু স্বরে বললেন, এই শরীরটা কি রকম জান? ভিতরের সব গ্রন্থিই খোলা, তাই যা কিছু ব্যারাম হয় পূর্ণ ভাবে হয়। সমস্ত লোমকূপের গোড়া পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থিই খোলা। তাই সমস্ত শরীরে

ব্যারামগুলিও সাময়িকভাবে বেড়াবার সুযোগ পায়। আবার ওষুধ যখন খাওয়া হয়েছে তাও ঐ রকম সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া গেছে। শরীরটা ত ওষুধ খায় না তাই শরীরটাকে ওষুধের অধীন করে নিতেও সময় লাগে ত ?

সত্য সত্যই ঔষধ খাওয়ার দুই-তিন দিন পর মায়ের অবস্থা সঙ্কট-জনক হয়ে উঠলো। হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ। ভক্তবৃন্দ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। মা কিন্তু তখনও ধীর স্থির অচল অটল। মৃদু হেসে রঙ্গ করে বলছেন, 'নিভিতে গিয়াও বাতি জ্বলিয়া উঠিল।' ভালই ত হইয়াছে। আমি ত সকলকেই বলি, 'বাহির ছাড়িয়া অন্তরে যাইতে চেষ্টা করো। তাই ওষুধও অন্তরকে (হার্টকে) ধরিয়াছে। এ তো ঠিকই হইয়াছে। আমি বলি, বাহির ভিতর এক কর। তাই বাহির ভিতর এখন এক হইয়াছে।' এই কথা কয়টি বলে মা শিশুর মত সরল হাসি হাসতে লাগলেন। ডাক্তার পন্থও এবারে হাত জোড় করে বললেন, মা, আমি আর ঔষধ দেবো না। আপনি নিজে নিজে আরোগ্য লাভ করুন। তারপর অনুরোধ করলেন, গঙ্গাতীরে 'আনন্দময়ী সেবাশ্রমে' থাকবার জন্য।

ধর্মপ্রাণ ডাক্তার পীতাম্বর পন্থ এটোয়ায় সিভিল সার্জন ছিলেন। মায়ের একজন প্রধান ভক্ত। পেন্সন নিয়ে হরিদ্বারে এসেছেন। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বহুদিন। দ্বিতীয় বিবাহও করেননি। সন্তানাদিও নাই। হরিদ্বারে গঙ্গার উপরেই নিজের প্রকাণ্ড বাড়ি। সেই বাড়িটা 'আনন্দময়ী সেবাশ্রম' করে দিয়েছেন। এখন মাকে অনুরোধ করছেন সেই বাড়িতে পদধূলি দেবার জন্য। মা কিছুই বললেন না, মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। পরে শ্রীশ্রীমা ভক্তপ্রবর ডাক্তার পীতাম্বর পন্থের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। ধর্মশালা ছেড়ে ভক্তবৃন্দসহ এসে উঠেছিলেন গঙ্গাতীরের সেবাশ্রমে। এবং শারীরিক সুস্থতাও লাভ করেছিলেন।

এই সেবাশ্রমে আসা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে মা বলেছিলেন ঃ

হরিদ্বার ধর্মশালায় আছি। তখন রাত্রি প্রায় ২টা। হঠাৎ দেখি এক দেবীমূর্তি এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'জায়গা কোথায় করা হইল ?' আমি তাঁর প্রতি চাইলাম এবং বললাম, জায়গা আবার কি ? আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ে সেই দেবীমূর্তি কেমন যেন হয়ে গেলো। এর পরমুহূর্তেই হলো অন্তর্ধান। সেই সময় হইতেই আমার খেয়াল হলো, পীতাম্বর ডাক্তার ত তার সেবাশ্রমে থাকবার জন্য কত বলে গেলো। গঙ্গার হাওয়ায় শরীরও ভাল হবে। তার ব্যবস্থা মত কয়েকদিন যখন চললাম তখন এই কথাই বা শুনবো না কেন? তাদের উপরই ত শরীরের ভার দেওয়া হয়েছিলো। এইরূপ একটা ভাব জাগলো। বোধ হয় দরকার তাই এইসব হয়ে যাচ্ছে। রাত্রি শেষে ভোলানাথকে ডেকে ডাক্তারের নিকট পাঠালাম। যদি সম্ভব হয় আমাকে এখনই তার সেবাশ্রমে নিতে পারে। কিন্তু পূর্বে স্ট্রেচারের বন্দোবস্ত না থাকায় তখনই যাওয়া হলো না। মূর্তিটি আমাকে প্রশ্ন করেছিলো জায়গা কোথায় হইয়াছে ? সেই ভাব আবার জাগলো। আমিও বলে উঠলাম এই ধর্মশালায় যে স্থানটিতে আমি আছি তা তোমার জন্য রেখে আমি চললাম।

এর পর স্থান ত্যাগের ভাব আসলো। অবশেষে আমি সত্য সত্যই একদিন ধর্মশালা ছেড়ে এসে উঠলাম সেবাশ্রমে।'

* * *

১৩৪৪ সন। ফাল্গুন মাস। পূর্ণকুম্ভের যোগস্নান। আজ শিবরাত্রি। প্রথম স্নান। সাধুরা দলে দলে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানে চলেছেন। বাজনা ও সাধুদের মুখনিঃসৃত স্তোত্রাদিতে হরিদ্বার নগরী মুখরিত। মহাকুম্ভের যোগস্নানে লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হয়েছে। নাগা সন্ন্যাসীরা এক দলে চলেছেন, অপর দলে সন্ন্যাসিনীরা ; আবার সাধুদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতনামা তাঁরা চলেছেন হাতীর পিঠে করে। শিষ্যরাও চলেছেন দলে দলে। শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথও ভক্তবৃন্দসহ কীর্তন করতে করতে চলেছেন। সে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব দৃশ্য।

মা বললেন স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে, তুমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদের দলে একত্র হয়ে এই মহাকুম্ভের স্নানে গিয়ে যোগ দাও। মাতৃ-আদেশে স্বামী অখণ্ডানন্দ গুরু মঙ্গলানন্দ গিরির আশ্রমে কংখলে চলে গেলেন।

সেবাশ্রমে, মাতৃদর্শনে ভক্তরা এসেছেন। মা ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে কথা বলছেন।

'দেখ খণ্ড ছেড়ে অখণ্ড হতে পারে না। খণ্ডও অখণ্ডের মধ্যেই। আবার এই যে খণ্ড অখণ্ড বলছি ইহাও ভাষা মাত্র। শুধু বোঝবার জন্য। ঐ সব প্রশ্ন সে জায়গায় ওঠেই না।'

আবার মা বলছেন ভক্ত অভয়কে আসন প্রাণায়াম সম্বন্ধে।

'ভাব অনুযায়ী আসন হয়ে যায়। এক এক আসনে এক একটা ভাব প্রবল হয়। যেমন খাবার সময় এক রকম আসন হয়। ঘুমাবার সময় শুয়ে থাকা হয় তাও আসন। আবার বিষয় চিন্তা করবার সময় শরীরে এক প্রকার ক্রিয়াও আসন হয়। শ্বাসের গতিও ভিন্ন রকম হয়ে যায়। দেখলেই বোঝা যায়। বিষয় চিন্তায় মগ্ন। সেই ভাবে বসলে তার বিষয় চিন্তার সুবিধা হয় তাই বসবার নমুনা ঐরূপই হয়ে গেছে। এই রকম আধ্যাত্মিক চিন্তার সময়ও আপনা আপনিই আসন হয়ে যায়। কুম্ভক, রেচক, পূরকও আপনা আপনিই হয়ে যায়। এই ভাবে যখন আসনাদি আপনা আপনি হয়ে যায় তখনই বুঝতে হবে গ্রন্থি খুলে যাচ্ছে।'

এবারে মা বলছেন ডাক্তার পীতাম্বর পন্থকে, 'এক লক্ষ্যে চল, হিসাব করিও না।'

এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্প বললেন ঃ—

একজন লোক শুনেছিলো যে একলক্ষ জপ করলে ব্রহ্মানুভূতি হইবেই। তারপর সে জপে বসলো। সে জপ করে, আর একটা টিকটিকির শব্দ পেলেই তার মনে হয়—এই বুঝি আমার অনুভব হতে আরম্ভ হলো। এইভাবে তার লক্ষ জপ পূর্ণ হলো। কিন্তু কিছুই অনুভব হলো না। কারণ তার মন শুধু চারিদিকের শব্দের মধ্যেই

তাঁকে আদেশ দিলেন কংখলে মঙ্গলানন্দ গিরির আশ্রমে গিয়ে বিরিমত সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। সঙ্গে গেলেন ভোলানাথ ও অখণ্ডানন্দ।

হরিদ্বার থেকে ভোলানাথ ফিরে এলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। মা ভোলানাথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বলে উঠলেন,—'বিপদ আসিতেছে।'

কলকাতা ও ঢাকার ভক্তরা চলে যাচ্ছেন। মা'কে প্রণাম করতে এসেছেন সকলে। অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হয়ে মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করছেন। প্রাণহরা মা কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছেন। অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি।

মা বলছেন,—'আমি হাসিতেছি, আমার জন্য কি কাঁদিতে আছে? যখন যে অবস্থায় থাক ভগবানের চিন্তাটি যেন ভুল না হয়। প্রাণের ঠাকুরকে নিয়ে যত সময় দিতে পারো চেষ্টা করো।'

আবার নামগানে মেতে উঠলো মাতৃ-মন্দির। দেরাতুন আশ্রম। দিবারাত্র কৃষ্ণগুণ-গান। কৃষ্ণ কীর্তন। আনন্দময়ীর অবস্থানে আনন্দময় হয়ে উঠলো আশ্রম গৃহ। ভক্ত অভয় ভাবানন্দে বিভোর হয়ে কীর্তন শুরু করলেন ঃ

—সখি, কহ না গৌর কথা,
গৌর নাম অমিয় ধাম,
পীরিতি মুরতি দাতা।—

কীর্তনে মা'রও ভাব হলো। ভাবস্থ। ভাব-সমাধি। সারাদেহ ভূমানন্দে ঢল ঢল। মুখশ্রী দিব্য জ্যোতিতে ঝলমল। মায়ের এই ভাবময় মূর্তি নয়নগোচর করে উপস্থিত ভক্তদের হৃদয়ও যেন অমৃতরসে হয়ে উঠলো পূর্ণ। পরমানন্দ উপভোগ করতে লাগলেন তাঁরা মনে মনে।

* * *

ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত অতি গুরুভার ছন্দে দিন আসে রাত্রি যায়। আবার সেই রাত্রি প্রভাত! নব উষা!

অকস্মাৎ একদিন ভেঙে গেল এই আনন্দমেলা। ২৩শে বৈশাখ (১৩৪৫ সন) শুক্রবার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মহানিশায় ধীরে ধীরে মহা সমাধিতে নিমগ্ন হলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথ। চিরসন্ন্যাসী তিব্বতানন্দতীর্থ। পরম একটি ভাগবত জীবনের হলো অবসান। একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেললো সমস্ত পৃথিবীকে। ভক্তরা শোক-ভারাক্রান্ত স্তম্ভিত হৃদয়ে দেখলেন তাঁদের পরম আরাধ্য পিতাজীর দেহ নিষ্কম্প, দৃষ্টি স্থির, বদনমণ্ডল অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বিচলিত হলো তাঁদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়।

কিন্তু শ্রীশ্রীমা তখনও ধীর, স্থির, অবিকৃত, অচল, অটল। স্তব্ধ গৃহের নীরবতাকে ভঙ্গ করে শুধু মা কবিরাজকে বললেন, 'কি, তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে ত?'

স্তম্ভিত হৃদয়ে কবিরাজ মায়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন,—হ্যাঁ—মা।

এইভাবে নিঃশব্দে বাবা ভোলানাথ যাত্রা করলেন মহাপ্রস্থানের পথে। ভক্তরা পরমপুরুষের দিব্যদেহ বহন করে নিয়ে গেলেন মহাতীর্থ হরিদ্বারে। অবশেষে হরিদ্বারের গঙ্গায় দিলেন জল-সমাধি। সুরধুনীর পূতধারা বরণ করে নিল বিশ্বপিতার দিব্য দেহ।

* * *

পরবর্তী কালে মা ভক্তদের বলেছিলেন শ্রীশ্রীবাবা ভোলানাথের মৃত্যু-পূর্ব ঘটনার ইতিহাস।

'মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে ভোলানাথ বলিলেন, ভাত খাইতে ইচ্ছা করে। রাত্রি, তাই তখন দেওয়া গেল না। পরদিন ভোর বেলাতেই ভাতের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু যখন যোগেশ সেই ভাত ও মুগের জুস মিলাইয়া সরবতের মত করিয়া খাওয়াইতে গিয়াছে তখন বলিলেন, 'মা খাইয়াছে? আমি মা'র প্রসাদ ছাড়া খাইব না।' তখন যোগেশ আমার মুখে একটু দিয়া দিতেই কাতরভাবে ভোলানাথ আমাকে বলিলেন—'তুমি আমাকে এই প্রসাদ খাওয়াইয়া দিবে?' আমি

বলিলাম, ‘আমার ত হাত ঠিক থাকে না। আচ্ছা দিতেছি।’ এই বলিয়া আমিই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলাম, খুব তৃপ্তির সহিত সবটা খাইলেন। তারপর বলিতেছেন, ‘আমি তোমাকে একটু স্পর্শ করিব—’ এ ভাবটাও দেখিলাম শিশু যেমন মা’কে ধরিতে চায়, একেবারে সেই ভাব। আমি হাত বাড়াইয়া দিতেই দুই হাত দিয়া আমার হাত ধরিলেন। কিন্তু তখনই কাঁপিতে কাঁপিতে হাত পড়িয়া গেল। তারপর একবার বলিলেন, ‘তোমাকে দেখিব।’ প্রথমে পরিষ্কার দেখেন নাই, পরে পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, ‘দেখিয়াছি।’ এই বাসনা জাগিবে আমি জানিতাম, তাই কবিরাজকে পূর্ব হইতেই বলিতেছিলাম, ‘চোখটায় মাখন দিও। সাবধান মত সর্বদা লক্ষ্য রাখিও।’ একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তোমার কি খুব কষ্ট হইতেছে?’ বলিলেন, ‘হাঁ—হইতেছে। তবে কোথায় হইতেছে কিছুই বুঝি না।’ আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। কাত হইয়া ভোলানাথ শুইয়াছিলেন, আমার হাত দিয়া দুই তিন বার মাথা হইতে সর্ব শরীর হাত বুলাইবার মত হইয়া গেল। এর পূর্বে ত আর অসুখ অবস্থায় ধরা ছোঁয়াও বড় হয় নাই। সকলকে দিয়া সেবা করাইয়া নেওয়া হইতেছিল মাত্র। কিন্তু এখন এইভাবে একটা ক্রিয়া হইয়া যাওয়ার পর দেখিলাম ভাবটা বেশ আনন্দপূর্ণ। আর যেন কোন যন্ত্রণা নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল, ‘এখন কোন কষ্ট আছে কি?’ হাসিয়া প্রসন্ন ভাবে বলিলেন, ‘আনন্দ।’ আবার বলিলেন, ‘আমি যাই?’ আমি বলিলাম, ‘আসা যাওয়া কি আছে? ও কথা বলিতে নাই।’ তখন বলিলেন, ‘তুমি ত চিরদিনই আমাকে এ আশা দিয়া আসিতেছ।’ সন্ধ্যার পূর্বেই গোপাল আমাকে একছড়া মালা দিয়া গিয়াছিল, রোজই দিত। আজ আমি মালা ছড়া নিয়া ভোলানাথের ঘরে রাখিয়া দিলাম। কারণ জানিতাম রাত্রিতেই মালার দরকার হইবে। তখন মালা পাওয়া যাইবে না। শান্তি বলিয়াছিল সে মালাটা ছুঁইতে গিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল,

তাহার নাকি মনে হইতেছিল মালাটা ভারবহ। ভোলানাথের শরীর ত একেবারে উলঙ্গ ছিল। সন্ধ্যাবেলা বলিলেন, 'আমার শীত করিতেছে।' আমি তাহারই একটা গেরুয়া রংয়ের নূতন কাপড় দিয়া শরীর ঢাকিয়া দিলাম। কিছুদিন পূর্বে যখন সন্ন্যাস নেওয়ার কথা হয়, তখন ভোলানাথ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার উপর ত আমার মাতৃভাব আছেই, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারি না। যদি সন্ন্যাস দেই তবে প্রথম তোমাকে সকলের সম্মুখেই মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার হাত হইতেই প্রথম ভিক্ষা নিব।'

আমি দেখিতেছিলাম ঘটনাচক্রে তাহার সে কথা পূর্ণ হইয়া গেল। অন্ন ও বস্ত্র শেষ এই হাত দিয়াই নিল। আমি সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি ত কীর্তন ভালবাস, একটু কীর্তন শুনিবে?' বলিলেন, 'আচ্ছা।' আমি যোগেশকে ডাকিয়া কীর্তন করিতে বলিলাম। খানিক সময় কীর্তন হইল। তারপর কীর্তন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমার কি সন্ন্যাস মন্ত্র মনে আছে?' বলিলেন 'আছে।' আমি দেখিতেছিলাম প্রণব ও মন্ত্র বাহিরে উচ্চারণ না হইলেও ভিতরে যে হইতেছিল তাহা বোঝা যাইতেছিল। সন্ন্যাস মন্ত্র যদিও তিনি মানস সরোবরের তীরে শুনিয়াছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসের ক্রিয়াদি তাঁহাকে কুম্ভ স্নানের দিন করিতে বলা হইয়াছিল। এই অনুসারে তিনি নিজে নিজেই সেইদিন ক্রিয়াদি সব করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষের এবং ভোলানাথের দুইজনেরই দেখিলাম সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর বেশীদিন শরীর রহিল না।

দেহত্যাগের কিছু পূর্বেই তাহার মাথায় (ব্রহ্মতালুতে) হাত দিয়া বসিয়া আছি। ঐ ভাবেই হাত থাকিতে লাগিল। আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না—হইয়া যাইতেছিল। শেষ নিঃশ্বাস পড়িলে আমি কবিরাজকে বলিলাম—'কি তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে ত?' সে স্তম্ভিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভোলানাথের

দিকে চাহিল ও বলিল—'হাঁ মা।' এই ভাবে নিঃশব্দে সব হইয়া গেল।' ভোলানাথের জীবনপ্রদীপ নিভিয়া গেল।

*　　　*　　　*

সৃষ্টিলীলার অপার বিভূতি যে মাতৃভাবের দ্যোতনায় জগৎ চরাচর দীপ্তিমান হয়েছে, সেই অখণ্ড মাতৃভাবের সর্বতোমুখী প্রকাশ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সকল কথা ও কার্যে, সকল লৌকিক ব্যবহারে যায় দেখা। ভক্তজনের নিকট শিশুকন্যার মত আব্দার; শরণাগত আর্তের প্রতি মাতৃরূপে অভয় প্রদান, জিজ্ঞাসুর নিকট বাণীরূপে অন্তর্জগতের সত্য জ্যোতি প্রকাশ করা সকলই একই মহাশক্তির লীলাবিলাস।

মা বলেন, 'এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর্। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।'

আবার বলছেন, 'আমি তো তুমিই। একমাত্র তিনি আছেন বলেই তো আমি। মাত্র একটিবার বিশ্বাস শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করে যে বলতে পারবে—মাগো! তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না। তবে সত্য সত্যই মা নিজ-স্বরূপে তাকে দেবেন দেখা। তাঁর স্নেহময় অঙ্কে তাকে তুলে নেবেন।'

'দুঃখের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্য তাঁকে কোনও রহস্যময়ী আশ্রয় ভেবো না। মনে রেখো তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে প্রাণশক্তির মত বিদ্যমান আছেন। ফুলের যেমন মেরুদণ্ড, প্রতি জীবেরও তিনিই পরম আশ্রয়। তাহলে তোমার আর কিছুই করতে হবে না। তিনি তোমার সকল ভার লাঘব করবেন।'

'শুভমতি দিয়ে কর্ম করো। কর্মের ভিতর দিয়েই ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করো। সব কাজেই তাঁকে ধরে থাকো। তাহলে আর কিছুই ছাড়তে হবে না। তোমার কাজগুলি সুচারুরূপে হবে সম্পন্ন। লক্ষপতির সন্ধানও হবে সহজ। মা যেমন শিশুকে যত্নের দ্বারা বড় করেন, দেখবে তুমিও তেমন বড় হয়ে উঠবে। যখন যে কোন কাজ

করবে কায়মনোবাক্যে সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে। তাহলে কর্মে আসবে পূর্ণতা।'

ছয়

আমি কারে বা এখন ডরি
(আমি) বাহিয়া চলেছি তরি ॥
হোক্ না কেন তুফান ভারি।
ডুব্‌বে না হয় তরি ॥
যাঁর যাত্রি তাঁরই তরি।
আমি তাঁর ভরসাই করি ॥
(আমি কারে বা এখন ডরি।)

সুমিষ্ট কণ্ঠে মা গাইছেন। রায়পুর আশ্রমে। ভাবে বিভোর হয়ে। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর পদ্মপলাশ নেত্রদ্বয়। ভক্তরা ভাবানন্দময়ী শ্রীশ্রীমায়ের সেই ভাবমগ্ন মূর্তি নয়নগোচর করছেন আর শুনছেন তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত। সঙ্গীত নয় যেন কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিণী। একটা ক্লান্তিহীন অনির্বাণ উৎসাহ। কি এক অপূর্ব স্নিগ্ধ করুণা যেন তাঁর ভিতর থেকে উথলিয়ে উঠছে। কি আনন্দ! মা যে আনন্দময়ী। দিবসের খর আলো স্নিগ্ধ মৃদু হয়ে আসে। বাতাস স্বচ্ছ অমলিন। আশ্রমগৃহের বুকে নামে দিনশেষের ধূসর ছায়া। পাখীরা ঘরে ফিরে আসে। চারিদিকে ডাকতে থাকে ঝিঁঝিরা। গৃহাভ্যন্তরে জ্বলে প্রদীপের আলো। শিখাময়। স্নেহময়। আর সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিশ্বজননীর হাসিভরা মুখ।

মা বলছেন, ভোলানাথকে বলতাম, 'শরীরটা ত তোমাদের কাছেই ফেলে দিয়েছি, তোমরা যা পার করাইয়া লও।' কিন্তু তাঁরা দেখতেন শরীর—নিচ্ছে না ফিরাইয়া দিচ্ছে। তাঁর ভাবের কোন

পরিবর্তন হলেই এ শরীরটার ভিতর এমন একটা অস্বাভাবিক ক্রিয়া হতো যে দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে যেতেন। কি যে করবেন মহা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

আবার বলছেন, 'ভগবান লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে যে তাপ সহন করতে হয় সেই তাপ সহন দ্বারাই ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের সহায়ক হয়। যেমন দেখ না যজ্ঞ করতে গিয়ে আগুনের তাপ সহন করছো, আবার সেই অগ্নিতে সব আহুতি দিচ্ছ। জপ করতে বসলে জপ করতে ইচ্ছা করে না। অধৈর্যসত্ত্বেও যে চেষ্টা করছো সেই হলো তাপ সহন করা। আবার উদয়াস্ত কি অষ্টপ্রহর নাম যজ্ঞ করবে সঙ্কল্প করে নাম আরম্ভ করেছো, নাম যজ্ঞে কি করছো ? না, বাজে চিন্তা, বাজে কথা, নাম রূপ যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছ। অসহনীয় হলেও সঙ্কল্প রক্ষার জন্য তাপের মত সহ্য করেও নাম করে যাচ্ছো। নামের আনন্দ আর সাধারণ লোকের কতটুকু সময় থাকে ? কাজেই বলি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যে তাপ সহন করা হয় তাতেই ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের সহায়ক হয়। তাকেই তপস্যা বলে। আবার দেখ আগুনে যেমন জল শুষ্ক করে দিতে পারে, আবার জল যেমন শীতল করে দিতে পারে সেই রকম একবার যদি তাঁর তাপ বা প্রতাপ নিতে পার তবেই ত ত্রিতাপের শান্তি। তাঁকে পাবার জন্য যে অস্থিরতা বা মনের চঞ্চলতা, ইহাই হলো তাঁকে পাওয়ার পথের সহায়ক। চঞ্চল মন নিয়ে তাঁর পূজা তাঁর নাম জপ, এ চিন্তায় কি ফল হবে ? ইহা ভাব কেন ? তাঁর জন্য অশান্তি না হলে শান্তি হয় না।

এই যে সংসারে যে তাপ মনে করা হয় তাও কিন্তু তপস্যা। যেমন রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যেও ছেলেরা পড়বার জন্য স্কুল কলেজে যাচ্ছে, চাকুরী করতে যাচ্ছে। এই সবই তপস্যা, যদি ভগবানের দিকে লক্ষ্য থাকে।'

আবার বলছেন, 'লক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক এক রকমের উহাও কিন্তু তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। কারণ সৃষ্টি স্থিতি লয় সব সময়ই হয় কি না।

তপস্যা শব্দের অর্থ তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তোমরা জান।" এই কথা বলেই মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে জাগতিক কর্মাদি করা হয় তাতে নূতন কর্মের সৃষ্টি হয় না। কারণ ইহাতে সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হয় কি না। বাসনাতেই ত কর্মের সৃষ্টি। ভগবান লাভের বাসনাকে বন্ধনের কারণ বলে না। জাগতিক কর্মের অনিচ্ছার ভিতর যদি ভগবৎ প্রাপ্তি কর্ম ইচ্ছা থাকে তবে তা বন্ধনের কারণ হয় না। কাজেই ভগবৎ কর্মের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন।'

মা আরও সহজ করে বলছেন, 'যেমন বলা হয় নিজের স্বরূপ দেখবার জন্য গায়ের ময়লা ধুতে গায়ে সাবান মাখা হয়। সাবানও ত ময়লাই, তাও না ধুলে ত নিজের স্বরূপ দেখা হয় না। আবার দেখ এর মধ্যেও জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি আছে। যেমন সাবান গায়ে লাগলেও শুধু হবে না, তা দিয়ে ঘষতে হবে, তারপর জল দিয়ে ধুতে হবে। তবেই না স্বরূপ দেখতে পাবে। সেখানে কিসে ধোয় জান? জ্ঞান গঙ্গায়।'

'জ্ঞান গঙ্গায় ধুইয়ে নেয়।'

ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের অমৃতময়ী বাণী। অমৃতময় বাণী নয় এ যেন ভাগবত রসের অমৃতময় প্রবাহ তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটে চলেছে। রায়পুরের আশ্রমগৃহ মাতৃময় হয়ে উঠেছে জগজ্জননীর আবির্ভাবে মাতৃময় হয়ে উঠেছে সমস্ত জগৎ সংসার।

মা হেসে হেসে রহস্য করে বলছেন, 'আমার ত আবোল-তাবোল কথা।'

ক্রমশ সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসে। ভক্তদের কিন্তু উঠবার নামটি নেই।

মা আবার বলছেন, 'তোমার ভিতরেই সব আছে। আনন্দ ও শান্তি চাচ্ছ। তা আবার স্থায়ী আনন্দ না হলে তোমার তৃপ্তি হচ্ছে না। আজ হয়তো একটা জিনিস নূতন দেখে তোমার কত আনন্দ

হচ্ছে আবার পরক্ষণেই আর সেই জিনিস তোমাকে সে আনন্দ দিচ্ছে না। এই ভাবেই সাধক মন চাচ্ছে স্থায়ী আনন্দ। আর দেখ স্থায়ী আনন্দের স্বাদ যে তুমি জান তাই তুমি চাচ্ছ। তাই বলি তোমার ভিতরেই সব আছে। তোমাদের বাহির ভিতর আছে কি না তাই ভিতর বলা হয়। আবার দেখ এই যে বলা হয় এই শরীরটা যা দেখে তদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে যায়। ভেবে দেখ সকলের মধ্যেই কিন্তু তা কিছু কিছু প্রকাশ পায়।'

সুন্দর উপমা দিয়ে মা ব্যাখ্যা করছেন গভীর তত্ত্বকথা।

'যেমন দেখ কেহ ছেলে মেয়েদের খাওয়াতে বসেছে, গ্রাস মুখে দেবার সময় তারও মুখ খুলে যাচ্ছে। একজনকে কাঁদতে দেখে তোমারও চোখে জল আসলো। একজনের হাসি দেখে তোমারও হাসি পেলো।

একজনের রোগ দেখতে দেখতে তোমারও শরীরটা অসুস্থ বোধ হয়। তবেই দেখ যা সামনে আসছে ঘটছে, তোমরাও কতকটা তদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে যাচ্ছ। হবে না কেন?

ভগবানকে চিন্তা করতে করতে সাধক তদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে যায়। কাজেই বলা হয় তোমরা নিজেকে জানতে চেষ্টা করো, তবে সব জানতে পারবে।

তুমি সিংহস্বরূপ। তোমার আত্মা শুদ্ধস্বরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমার ভিতর সুপ্ত রয়েছে। দুর্বলতাই পাপ।

যে কুসংস্কার তোমার মনকে আবৃত করে রেখেছে তাকে তাড়িয়ে দাও। সাহসী হও। সৎ চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে দাও। সত্যকে জেনে তা জীবনে পরিণত কর।'

শেষের কথাগুলি মা বেশ জোর দিয়েই বললেন। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেলো। নিঃশব্দে নেমে এলো রাত্রি। ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো রায়পুর আশ্রমে।

অবশেষে মা অধিক রাত্রিতেই শয্যা গ্রহণ করলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়।

নব-উষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রায়পুরের আশ্রম গৃহ। প্রভাত সূর্যের স্বর্ণ কিরণ এসে নৃত্য করতে শুরু করে দেয় আশ্রম গৃহের দেয়ালের গায়। সুললিত কণ্ঠের উচ্চারণ ধ্বনি গৃহাভ্যন্তর হতে উত্থিত হয়······চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে সে ধ্বনির মধুর তরঙ্গ বয়ে চলে। ভক্ত সাধু সিং সুর করে 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করছেন।

* * *

পুন্‌নী পাপী আখন নাহ
কর কর করনা লিখনে জাহ্
আপে বীজি আপেহি খাহ্
নানক, হুকমী আবে জাহ্ ॥

ধর্মপ্রাণ সাধু সিং শিখ ধর্মাবলম্বী। অনেক দিন হলো মায়ের সংস্পর্শে এসেছেন। তিনি মা'কে বলেন—'মা, আমি দেখি আমাদের গ্রন্থসাহেবের ভিতর যাহা লিখা আছে আপনার মুখ হতে সেই সেই ভাবের কথাই শুনতে পাই। আমার ইচ্ছা আপনার কাছে একটু গ্রন্থসাহেব পাঠ করি।'

মা মৃদু হেসে বলেন, 'বেশ তো, তোমার ইচ্ছা হয়েছে পড়বে।'

তাই প্রভাত সময়ে 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করে ভক্ত সাধু সিং শোনাচ্ছেন মা'কে। জগতের জননীকে। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা'কে। ভাবানন্দময়ী মা গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনতে শুনতে ভাবস্থ হলেন। ভাব সমাধি। ভাবে বিভোর হয়ে অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন।

মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্ত সাধু সিং।

সাত

"হৃদয় দুয়ারে আজি কে ডাকিল,
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম,
ওকি শুনিলাম, শুনিলাম, শুনিলাম (৩)
শুনিয়া সে বাণী তাঁর, আমি রহিতে না পারি আর
হৃদয় আকুল আজি হইল, হইল, হইল (৩)
মোহ মদিরা নিয়ে, আমি অচেতনে ছিনু শুয়ে,
কে আজি আসিয়া মোরে জাগাল, জাগাল, জাগাল ॥

ভাটিয়ালি সুরে মা গাইছেন। সোলনে। নাম গানে মেতে উঠেছে পার্বত্য রাজধানী। সিমলা থেকে এসেছেন ভক্তরা। বহু ভক্তসমাগম হয়েছে। ভাইজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষে এই নাম গান।

মাতৃকণ্ঠের অপরূপ স্বপ্ন-সৃষ্টি-করা সঙ্গীত। এ যেন সঙ্গীতদেবীর সুরসৃষ্টি। হৃদয়-আলোড়ক—অপূর্ব সঙ্গীত। ভক্তবৃন্দের অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে পরমানন্দের স্রোত।

অপরূপ রাত্রি। অন্ধকার টলমল করছে জ্যোৎস্নার প্লাবনে। ভক্তরা মোহাচ্ছন্নের মত বসে আছেন মাকে ঘিরে।

২৩শে শ্রাবণ। সোমবার।

কীর্তন শুরু হলো। উদয়াস্ত কীর্তন চললো। মালা চন্দনে সেজে রাজা প্রজা সকলে মিলেই কীর্তন করছেন। নাম গান। কৃষ্ণ গুণগান। মন্দিরের একখানি ঘরে ভোগের ব্যবস্থা হয়েছে। পাঁচখানি আসন পেতে নিমাই, নিতাই, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিবাস ও গদাধরের ভোগ দেওয়া হলো। একজন বৈষ্ণব পূজা করলেন। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তবৃন্দ প্রদক্ষিণ করতে করতে ভোগের

গান ধরলেন। মাকেও সেখানে নিয়ে আসা হলো। শ্রীশ্রীমাকে আসনে বসিয়ে ভোগ দেওয়া হলো। মা আনন্দময়ীর আবির্ভাবে এক অলৌকিক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। কীর্তন বন্ধ হলো না। অবিরাম চললো। কীর্তন খুব জমে উঠলো। মার ভাব হলো। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে ভাবানন্দময়ী মা নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব। রাজা-উজীর, প্রজা-কর্মচারী সকলেই কীর্তনে মেতে উঠেছেন। নামের ধ্বনিতে পার্বত্য রাজধানী যেন ঝম্ ঝম্ করতে লাগলো। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার।

কৃষ্ণ নামের ধ্বনিতে মা'র ভাবেরও হলো পরিবর্তন। ঢল ঢল ভাবময় মূর্তি ধারণ করলেন। ঢলে মাটিতে পড়ে গেলেন। এই ভাবেই রইলেন। কিছু সময় পর উঠে বসলেন।

দৃষ্টি স্থির। চক্ষু রক্তবর্ণ। জলে ভরা। জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি মায়ের সেই অভাবনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্তবৃন্দ।

ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা।

আরতি হলো শুরু। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকেও আরতি করা হলো।

সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য। অবশেষে কীর্তনের দল মাকে অগ্রে নিয়ে কীর্তন করতে করতে যোগীভাইয়ের ধর্মশালায় এসে উপস্থিত হলেন। ভক্তরা মাকে ঘিরে বসলেন। মায়ের মুখ-নিঃসৃত অমৃতময় বাণী শুনবেন। মা আবেশজড়িত কণ্ঠে কথা বলতে লাগলেন। কি মধুর সে কণ্ঠস্বর!

একজন ভক্তিমতী স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করছেন, 'মা, সংসারের কাজ, কখন নাম করবো?'

মা হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে বললেন:

মন্‌মে হরিকা নাম
হাতমে দুনিয়াকা কাম
ইস্‌সেই মিলেগি পরমাত্মা রাম।

এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো যোগীভাইয়ের ধর্মশালায়। তারপর অকস্মাৎ সদ্য গড়ে ওঠা সোলনের আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে চিরদিনের লীলাপথে মা আনন্দময়ী হয়ে গেলেন অদৃশ্য। শ্রীশ্রীমা সোলন হতে চলে এলেন দেরাদুনের কিষণপুর আশ্রমে।

* * *

পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা'র আগমনে আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো দেরাদুন। কিষণপুর আশ্রম। বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। নানা জাতি,—নানা সম্প্রদায়ের মানুষ আজ মায়ের কৃপাপ্রার্থী। একজন শিখ সম্প্রদায়ের সাধু এসেছেন। মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। ব্যাকুল হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করছেন,—মা তোমার কাছে এসেছি। সাধু সঙ্গ করতে পেরেছি। এমন আবার ভিখারী থাকবো কেন?

মা মৃদু হেসে বলছেন,—তাঁর সঙ্গ করতে পারলে ত আর কথাই থাকে না। সঙ্গ করা হয় কই?

সাধুটি বললেন, তবে কি কিছুই হয় না?

মা বললেন, কিছুই হয় না একথা আমি বলতে পারি না। ভয়ানক রৌদ্র, গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে, গাছের স্বভাবই ছায়া দান করা। ছায়া তুমি পাবেই। যতক্ষণ গাছের নীচে থাকবে। গাছের প্রভাব তোমার উপর আসবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তুমি যদি গাছের ছায়ায় একবার দাঁড়িয়ে আবার রৌদ্রে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাক তবে পরিশ্রান্ত হইবেই।

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, মা, সকলেই বলে কলিযুগে নামই একমাত্র সাধন। অথচ আমি দেখি অনেক স্থানে অনেকে কত বছর যাবৎ এই নাম করছেন, কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না ইহার কারণ কি?

মা প্রত্যুত্তরে বললেন, দেখ নাম ও নামী ত এক। যেমন আমি

যদি তোমার নাম ধরে ডাকি, তুমি এসে হাজির হবে। কাজেই নামেই কাজ হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কখনও কখনও দেখ না কোন কোন ছেলে মেয়েরা পড়েই যাচ্ছে, কিন্তু তাদের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সেই রকম আর কি। আরও দেখ ঐ নাম নিয়ে হয়তো অনেকটা পবিত্র হয়েছে, না নিলে হয়তো আরও কত খারাপ হয়ে যেতো।

শিখ সাধুটি এবারে জিজ্ঞেস করছেন,—মা, জীবন্মুক্তদের কি স্বপ্ন হয়?

মা মিষ্টি হাসি হেসে বললেন,—যারা চিরজাগ্রত তাদের স্বপ্ন কি করে হবে? আর স্বপ্ন যদি বল তবে এই যে আমরা সব দেখছি সবই ত স্বপ্ন।

শিখ সাধুটি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী শুনে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে বললেন,—মা, তুমিই একমাত্র আলোক। আমরা সব পতঙ্গ। তাই আজ তোমার কাছে এসেছি। আলো তো পতঙ্গের কাছে যায় না। পতঙ্গই আলোকের কাছে আসে। আর দেখ, অগ্নি ত সর্বত্রই আছে; কিন্তু চুলার ভিতরে আগুনের বিশেষ প্রকাশ, তাই সেই আগুনে কত কাজ হয়। তোমার মধ্যেই তাঁর প্রকাশ, তাই ত তোমার কাছে এসেছি। তোমার মধ্যে যে পূর্ণ আনন্দ তা আমাদেরও দাও। তুমি যে আনন্দময়ী। তুমি আনন্দে ভরে আছ। তাই আমরা এত লোক তোমার কাছে এসে আনন্দ পাই। শান্তি পাই।

মা মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর করলেন,—পিতাজী, তুমি যদি সেই আনন্দের খবর কিছুই না জান, তবে তার সন্ধান করছো কেন? নিশ্চয়ই তোমার ভিতর তা আছে।

শিখ সাধুটিও ছাড়বেন না, বললেন,—মাতাজী, তাঁর সঙ্গস্পর্শের আনন্দের একটু আভাস দাও।

পুনঃপুনঃ অনুরোধে মা মিষ্টি হাসি হেসে বললেন,—দেখ, এক

লক্ষ্যই হলো উপায়। সেই এক-কে পেতে হলে, সেই পরমপুরুষের সঙ্গ করতে হলে, একলক্ষ্য হওয়া চাই। আর চাই সেবার ভাব। সেবা। সেবা। সেবা। সেবার ভাব যতই থাকবে ততই তাঁতে ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধার প্রকাশ বেড়ে যাবে। তাঁর সঙ্গ-স্পর্শের আনন্দ-পরমানন্দ অনুভব করবে। আর দেখ পিতাজী, আমরা এক এক গ্রাস করে খাই। এক পা এক পা করে হাঁটি। এক রাস্তা ধরে চলি। এক অক্ষর এক অক্ষর করে লিখি। কাজেই এক নিয়েই ত আমরা আছি। আবার আমাদের ভিতরই অব্যক্ত অনন্ত সব রয়েছে। অন্তের মধ্যে অনন্ত। আবার অনন্তের মধ্যেই রয়েছে অন্ত। সর্বরূপে যে তিনিই। সর্বাবস্থায় তাঁর চরণ শরণ। চরণ সেবা। জীব সেবা। সেবার দ্বারা ভগবানকে প্রাণময় করে তুললেই, পরমানন্দের আভাস পাওয়া যায়।

এবারে শিখ সাধুটি খুব খুশী হয়ে দেবীজ্ঞানে শ্রীশ্রীমাকে হাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন,—'মা বড়ই আনন্দ পেলাম তোমায় দর্শন করে আর তোমার শ্রীমুখের কথা শুনে। তারপর ভাবানন্দে বিভোর হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পদতলে বসে কীর্তন করলেন।

* * *

মত্ বিচ রতন্, জবাহর মাণিক,
যে ইক গুরাকী শিখমুনী, গুরাঁ ইক দেহি বুঝাই।
সভন্ জীয়াকা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই॥

কীর্তন শুনতে শুনতে মাও হলেন ভাবস্থ। ভাবসমাধি।

আট

—'মনের যেমন চঞ্চল স্বভাব তেমন স্থিরতাও মনেরই স্বভাব। দেখ, যেমন ছোট ছোট ছেলেদের ইচ্ছা না করলেও তোমরা কত যত্নে লেখাপড়া শেখাও। ক্রমে তারা বিদ্বান হয়ে ওঠে। সেই রকম মন বাচ্চাটাকেও তোমরা শিক্ষা দিতে চেষ্টা কর। মন চায় প্রকৃত শান্তি। জাগতিক কোন বিষয়েই সে স্থায়ী শান্তি পায় না। তাই ছুটাছুটি করে।

আর গুরু না থাকলেও সাধন ভজনের প্রথম উপায়—যাব যা ভাল লাগে করে যাও। যেমন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তোমরা প্রথমে সব বিষয়েই কিছু কিছু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করো, পরে এর ভিতর হতেই বোঝা যায় তার কোন্ দিকে রুচি। সে সেই বিষয়টাই বেছে নেয় এবং অপরগুলি ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট পথে চলতে চলতেই উন্নতি লাভ করে। তেমনই তোমরা নানা বিষয় প্রথম পড়তে আরম্ভ করো। যেমন সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, কিছু কিছু কীর্তন, জপ ইত্যাদি। এই সব করতে করতেই কোন্ দিকে তোমার রুচি, কোন্ পথে তোমার যেতে হবে তা বুঝতে পারবে। তখন সেই পথ ধরে ধরে চলতে থাকবে, দেখবে যা দরকার হয়ে যাবে।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন ডাঃ পান্নালালকে। এলাহাবাদে। ভক্তপ্রবর শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের বাড়িতে। মা এসে উঠেছেন ভক্ত শিবপ্রসাদের বাড়িতে। বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। সাধারণ অসাধারণ সব রকমের মানুষই মাকে দর্শন করতে এসেছেন।

এসেছেন স্যার শ্রীযুত তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাক্তার সি. ওয়াই. চিন্তামণি, মিস্টার জসটিস্ মুল্লা, খানবাহাদুর সৈয়দ আবু মহম্মদ খাঁ,

ডাক্তার এন. পি. আসথানা, অনারেবল মিস্টার পি. এন. সপ্রু, ডাক্তার এল. ডি. যোশী, .মিস্টার এ. এম. খাজা, ডাক্তার তারাচাঁদ, মিস্টার এম. লাহিড়ী আর এসেছেন কমিশনার শ্রীযুত ডাক্তার পান্নালাল,. আই. সি. এস.। প্রথম দর্শন।

জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। শ্রীযুত পান্নালাল। মন স্থির করবার উপায় সম্বন্ধে মা'কে জিজ্ঞেস করায়,—মা মৃদু হেসে তৃপ্তিকর ভাষায় বিচিত্রভাবে রসাশ্রিত করে এই কথাগুলি বললেন।

মনোমুগ্ধকর উত্তরটি শুনে শ্রীযুত পান্নালাল তৃপ্ত হলেন। মনের সংশয় দূর হলো।

মা আবার বলছেন, গৈরিক বেশ, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য! কোন প্রয়োজন নাই বৈরাগ্যের। যেমন আছ সেইভাবে থেকে কেবল চেষ্টা কর সর্বদা নাম করবার। নাম ভগবান্—একেবারে যদি তাঁকে ধরে থাকতে পারো তবে চিন্তা কি? যে রাজার কাছে সর্বদা থাকে সে দ্বারবানগণের কৃপা ভিক্ষা কেন করবে? যার জিহ্বা নাম-গানে কুণ্ঠিত, সে বৈরাগ্যের কথা ভাবুক। যে নাম করতে পারে বৈরাগ্য তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে থাকে।

বেদ উপনিষদ পুরাণ তন্ত্র সংহিতা সবই সেই এক জনকে লাভ করবার পথ নির্দেশ করছেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথের কথা বলেছেন। সকলের লক্ষ্য সেই একে স্থিতি। এক ব্যতীত দুই কেহ চাহেন না। কেহ মিলন চাহেন, কেহ বা মিশ্রণ চাহেন—এই মাত্র প্রভেদ।

*　　　*　　　*

পরদিবস ডাঃ পান্নালাল আগ্রহভরা প্রাণে আবার এসেছেন ছুটে মায়ের কাছে। মা'কে দেখবেন। মায়ের মুখের কথা শুনবেন। প্রাণহরা মা ডাঃ পান্নালালের প্রাণ নিয়েছেন হরণ করে। শ্রীযুক্ত পান্নালাল আই. সি. এস. (কমিশনার) এখন ভক্ত পান্নালালে হলেন রূপান্তরিত।

মা মৃদু মৃদু হাসছেন আর বলছেন, "এই যে তোমরা কর্ম করে যাও, এ যেন 'রিটার্ণ টিকেট'—আবার ফিরে আসবার বন্দোবস্ত করে যাচ্ছ।"

আবার একজন শিক্ষয়িত্রীকে লক্ষ্য করে মা বলছেন,—তোমরা এত লেখাপড়া কর, ঐদিকের লেখাপড়ায়ও একটু একটু টাইম দিও, এই আমার আরজি।

আবার বলছেন মা ভক্তদের, নাম কর, নাম কর। নাম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। সত্য প্রতিষ্ঠা হয়। নাম ভিন্ন এই দারুণ যুগে কে পবিত্র করবে? কার বলে চিত্তশুদ্ধি হবে? হেলায় শ্রদ্ধায় নাম কর। নিশ্চয়ই তুমি তাঁর কৃপালাভ করবে। প্রথমে সাধুসঙ্গ কর। তোমার নামে রুচি হবে। তারপর সর্বদা নাম করবার চেষ্টা কর। প্রথমে তা পারবে না—ভুল হয়ে যাবে, তা হোক। পুনরায় সাধুসঙ্গ করে উৎসাহ বাড়িয়ে নিয়ে নাম করবে। 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। তখন নাম নিয়মিত করতে পারবে। অশুদ্ধচিত্তে নাম ভুল হয় বলে ভগ্নোৎসাহ হয়ো না। নামই তোমায় নাম করবার শক্তি দেবেন। নামই তোমার সর্বপাপ ক্ষয় করে দিয়ে তোমায় নব জীবন দান করবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী এসেছেন মাকে দর্শন করতে। বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মায়ের গলায় ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করলেন। প্রতিমা দেবীও ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করলেন। তারপর মা'কে নিয়ে গেলেন বন্ধু কিটলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য। বৃদ্ধ কিটলী সাহেব জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে প্রণাম করলেন এবং খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য।

বৈকালে শ্রীশ্রীমাকে বেসেন্ট হলে নিয়ে আসা হলো। ফুলে ফুলে মা'কে ভরে দিয়েছে। ফুলের মালায় সজ্জিত হয়ে মা অপরূপ দেবী মূর্তিতে হলেন প্রতিভাত। বহু লোক একত্র হয়েছেন। লোকে

লোকারণ্য। দরজায় প্রবেশ করতেই মেয়েরা গেয়ে উঠলো—'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।'

তারপর শুরু হলো নাম গান। কৃষ্ণ কীর্তন। কৃষ্ণগুণগানে মুখরিত হয়ে উঠলো বেসেণ্ট হল।

আর মুগ্ধ হলেন দর্শকবৃন্দ। ভক্তবৃন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী শুনে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

এই ভাবে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এলাহাবাদের লীলা সাঙ্গ করে যাত্রা করলেন কলকাতার পথে।

তেরশো পঁয়তাল্লিশ সালের আটাশে আশ্বিন। শনিবার।

নয়

—আচ্ছা বাবা, তুমি এই যে দেশের কাজ করছো, কেন করছো?

মা জিজ্ঞেস করছেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে। দক্ষিণেশ্বরে। পঞ্চবটীতে।

তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালের ৩রা কার্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দসহ এসেছেন পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে। বাংলার তপোভূমি দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রও এসেছেন। বসেছেন মায়ের কাছেই। পঞ্চবটীতে।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে ধীর ভাবে বললেন সুভাষচন্দ্র,—আনন্দ পাই।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা ইহা কি নিত্য আনন্দ না খণ্ড আনন্দ?

সুভাষচন্দ্র বললেন,—তা' ত বলতে পারি না।

এবারে মা মৃদু হেসে বললেন,—এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটিও একটু করিও বাবা! যদিও তোমরা বলতে পারো 'এই

কাজ ত নিজের জন্য করছি না। সকলের উপকারের জন্য। কিন্তু আমি বলবো'—এই বলেই আবার বলছেন, 'তোমরা যা বলাচ্ছো তাই বলছি, আমি ত লেখাপড়া কিছু জানি না।—তবে বলা হয়, এই যে সবই, নিজের জন্য। সকলেই সেই এক অখণ্ড আনন্দ 'চাইছে। কেন চায়? না, সেই রসটা আমাদের জানা আছে বলেই ত আমরা আবার চাইছি। তবে তোমরা বলতে পারো যে—এই সব করে কি হবে? কিন্তু বলা হয় যে, বাস্তবিক যদি এই দিকের কাজ করা যায়, নিজেকে নিজে জানতে পারে, তবে তাহা দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার স্বভাবতঃ হয়ে যায়। যেমন এম. এ., বি. এ. পাশ করে শিক্ষকরা কত মূর্খকে বিদ্বান করে দিচ্ছেন।'

আবার মা মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, 'বাবা, তুমি ত কত জায়গায় বক্তৃতা টক্তৃতা দেও। এখানে কিছু বল না বাবা, আমরা শুনি।'

সুভাষচন্দ্রও মৃদু হেসে বললেন,—'আমি কি এখানে শোনাতে এসেছি মা, আমি এসেছি শুন্‌তে। আপনার কাছ থেকে কিছু শুনে আনন্দ পেতে।'

মা অমনি বলে উঠলেন,—তবে এই মেয়েটা যা বলবে একটু শুনবে বাবা?

সুভাষচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বললেন,—চেষ্টা করবো।

আনন্দময়ী মা বললেন সুভাষচন্দ্রকে, 'শুধু বাইরের দিকে লক্ষ্য রেখো না বাবা একটু ভিতরের দিকেও লক্ষ্য করো। তোমার ত শক্তি আছে।'

সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন,—সেই পথ কি?

মা প্রত্যুত্তরে বললেন,—সেবা। বাস্তবিক সেবার ভাব জাগলে সেই পথ দিয়েও ভগবানকে পাওয়া যায়।

মা যেন শোনাচ্ছেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে সেই পুরাতন কথা: মানবসভ্যতার প্রভাতে ছায়াচ্ছন্ন তপোবনে ঝঙ্কৃত সেই শাশ্বত মন্ত্র,—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

*　　*　　*

'হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি। যিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।'

*　　*　　*

অবশেষে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, ভবিষ্যতের নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভক্তিবিগলিত চিত্তে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। হৃদয় তাঁর ভরে উঠলো দিব্যানন্দে। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য।

দশ

—মা'র বুঝি এতদিনে ছেলের কথা মনে পড়লো? বলছেন মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। বালানন্দ আশ্রমের মোহন্ত। বৈদ্যনাথ ধামে।

মা হঠাৎ কলকাতা থেকে এসেছেন দেওঘরে। বৈদ্যনাথ ধামে। উঠেছেন এসে নূতন একটি ধর্মশালায়। ভক্তপ্রবর প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মাকে আশ্রমে নিয়ে এসেছেন। কামধেনু মাতার মন্দিরে মা'র থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে আছেন। গুরুপ্রিয়া দেবীও আছেন। মা কথা বলছেন, ভক্তরা শুনছেন মায়ের মুখের অমৃতময় বাণী।

বাইরে দিবসের পীত আলোক ম্লান হয়ে আসে। ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা।

পরমযোগী সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মা'র গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা, ফল পুষ্পাদি দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে করলেন

প্রণাম। শ্রীশ্রীমাকে। জগজ্জননীকে। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মাকে।

তারপর আবদারের সুরে বললেন, এবার কিন্তু শীগ্‌গির মাকে ছেড়ে দেবো না। ১১ বৎসর পর ছেলেদের মনে করে এসেছ। একবার এখানে এসেও দেখা না দিয়ে চলে গিয়েছিলে, এবার কিছুদিন থাকতে হবে।

মা মৃদু হেসে বললেন, জানই ত এই মেয়েটার মাথা খারাপ, কখন কি খেয়াল হয়। এমন হয় বাবা। এত যে তোমরা আদর যত্ন করছো, অনুরোধ করছো, কোন দিকে যেন লক্ষ্য নাই। মাথা খারাপ কি না বাবা—কি বল?

আশ্রমের অন্যান্য ব্রহ্মচারীরাও মাকে বেশীদিন থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

মাও মিষ্টি বাক্যে সকলকে করলেন তুষ্ট। অবশেষে মা ব্রহ্মচারী মোহনানন্দজীর সাথে আধ্যাত্মিক আলোচনা শুরু করলেন।

মোহানন্দজী জিজ্ঞেস করছেন,—আচ্ছা মা, প্রাণবায়ু স্থির করার উপায় কি?

মা গভীর তত্ত্ব কথা সহজ করে বলছেন, প্রাণবায়ুরও তরঙ্গ আছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মন মন্ত্র শ্বাস এক করতে হয়। দেখ গাছ লতা জীব জন্তু ইত্যাদি যে হাওয়াতে পুষ্ট সেই এক যোগের বাতাস নিয়ে আছে বলে ত বসে থাকে। সেই বাতাসের মূলকেন্দ্র কোথায়? যেখানে তরঙ্গ বলে কিছুই নেই, সেই চিরশান্তত্ব ত চাচ্ছে। চাওয়াটা কেন? না, এটাও জীবের স্বভাব। সবই এক। এক বিরাট মহান ভাব সব বললেও এক বলা হয় না। সকলেই এক পথের যাত্রী।

মোহনানন্দজী আবার জিজ্ঞেস করছেন, তিনি অনন্ত। তাঁর পথে যাত্রা করলে যাত্রাও ত অনন্তই হবে? তবে কি এ যাত্রার শেষ নেই?

প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, সে সব ভাববেই না। অন্তের মধ্যে অনন্ত, অনন্তের মধ্যে অন্ত সবই যে আছে।

দেখ অনন্তের কথাটা যে তাও অনন্ত। কতটুকু কথায় হবে? আর বাইরেই বা কতটুকু শোনা হবে? সাধনার গতিও অনন্ত। তোমরা যে অনন্ত বলে থাক তোমাদের কাছে অনন্তত্ব কখন প্রকাশ পায়? যখন অনন্ত বোধে আসে তখনই ত? বোধে এলেই স্বরূপের প্রকাশ। অনন্ত যাত্রার সফলতা। তুমি নিজেই যে অনন্ত। তুমি নিজেই এক। স্থূলতঃ দেখতে পাচ্ছ। তোমার হাত ধরলে ও কে? বল আমি। পা ধরলেও বলবে আমি। যে কোন অঙ্গ ধরবো বলবে আমি। দেখ তোমার শরীর রূপে যে প্রকাশ পাচ্ছে, তোমার সৃষ্টির কারণ ত বলতে পারবেই না। তোমার জন্মটা বাদই না হয় দিলাম। শৈশবের প্রথম জ্ঞানের সাথে সাথে কি কি করেছো সব বলে দিতে পারবে? তাও বাদ দিলাম। গত পাঁচ বৎসরের কথাই বল ত? তোমার জীবনের কি কি ঘটনা হয়েছে বলতে পারবে না। এক বছরের কথাই বল। এক মাসের কথাই বল। একটা দিনের কথা। অন্ততঃ আজ সকাল বেলাটা হতেই বল ত? আচ্ছা তাও ছেড়ে দিলাম, গত পাঁচ মিনিটের কথাই বল ত? তোমার মনটা কোথায় গিয়েছিলো তাও বলতে পারবে না। স্থূলতঃ তোমার এই শরীরের মধ্যেও মুহূর্তে মুহূর্তে কত সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়ে যাচ্ছে তারও সংখ্যা দিতে পারবে না। সামান্য মনের গতিই যখন এই রকম, অন্ততঃ এখন দেখ। যাত্রাটা যদিও অনন্ত। আবার একের গতির ধারাও ত রয়েছে। কোন্ মুহূর্তে সেই জ্ঞানের যোগ আসবে কে বলতে পারে? কাজেই নিজের খোঁজেই নিজে যাত্রা করছো। আসল কথা নিজেকে জানা। আমি অনন্ত গতিরূপে আমিই এক। আবার আমিই বহুরূপে প্রকাশ। জাগতিক যে সব তোমরা বহুরূপে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু যেখানে রূপ অরূপের দ্বন্দ্ব নাই সেইটা চাওয়াই জীবের স্বভাব। যেমন জঙ্গলের মধ্যে থেকে জঙ্গল কেটে রাস্তা করে বের হওয়া হয়। তোমরা সব সময়ই জাগতিকের মধ্যেই আছ কি না তাই অস্থিরত্ব। কিন্তু তরঙ্গশূন্য যে স্থিরত্ব তার আভাস পেতে হলে সব

সময়ই তোমাদের সেই তরঙ্গরূপী শ্বাস প্রশ্বাস, তার দিকে স্থির লক্ষ্যে মনটা রাখলে সহায়ক হয়। এ সবকিছুই এক। নিজ স্বরূপ জানাই হলো লক্ষ্য।

এবারে মা মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন,—'অখণ্ড মণ্ডলাকার আর কি।'

আবার বলছেন, 'তুমি ত বাবা সাধক। সাধকরা দেখ এই এক লক্ষ্যের জন্য, এই মনের দ্বারাই একত্বে পৌঁছবার যাত্রী হয়। এক গুরুর কৃপায়ই খণ্ডত্ব ও অখণ্ডত্ব, সীমা ও অসীম, অনন্ত গতি, অনন্ত রাস্তা, অনন্ত ভাব, সবই নির্দ্বন্দ্ব রূপে তার কাছে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সৃষ্টি স্থিতির মধ্যে যতক্ষণ থাকবে—এসব কথা আসবেই। আর আসাটাও মঙ্গলকর। এই সব বিচারে না আসলে নির্দ্বন্দ্বরূপে বাক নির্বাকাতীত হবে কিরূপে?'

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে তৃপ্ত হলেন।

অবশেষে মাকে নিয়ে এলেন গুরু শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর তপস্যার স্থানে। পাহাড়ের উপর। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। পবিত্র ভূমি। বালানন্দজীর প্রতিমূর্তি রাখা হয়েছ। ব্রহ্মচারীরা সাধন ভজন করছেন।

এই পবিত্রভূমিতে পদার্পণ করে মা খুবই আনন্দিত হলেন এবং কিছু সময় অবস্থান করে আবার ফিরে এলেন আশ্রমে। বালানন্দ আশ্রম আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে। মা যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই বসে যায় আনন্দের বাজার। এইভাবে মা অপূর্ব প্রাণের খেলা খেলে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় অকস্মাৎ যাত্রা করলেন এলাহাবাদের পথে।

এগার

শরতের নিস্তব্ধ প্রভাত।

আকাশে নির্মল নীলিমা। সূর্যদেব উদয়াচলের পথে। কিন্তু মাঠে তখনও শিশিরবিন্দু ঝক্ ঝক্ করছে। সুপ্ত প্রান্তর থেকে মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীর ধীরে ধীরে আসছে ভেসে। আর্দ্র নীরব বনভূমিতে বিহঙ্গদলের প্রভাত-কল-কাকলী।

নব-ঊষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বিন্ধ্যাচলের আশ্রমগৃহ। গৃহান্তরাল থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে মাতৃকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতের স্বর। অপরূপ স্বপ্নসৃষ্টি করা সে সঙ্গীত। দিব্য সঙ্গীত। ভাবানন্দময়ী মা গাইছেন,

—গোকুল বিহারী, দয়াময় হরি,
বৃন্দাবন বনচারী।

প্রভাতে মাতৃকণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীতে ভরে যায় শূন্য দিগঙ্গন। আনন্দ···আনন্দ···আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই এই বিশ্বভুবনে। ······ওগো মহানন্দ। অনন্ত অপার······।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। ব্রহ্মানন্দময়ী মা ভাবে বিভোর হয়ে নাম গানে মেতে উঠেছেন। মুখমণ্ডল দিব্য আনন্দের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। সারা দেহ ভূমানন্দে ঢুলু ঢুলু। দুই চোখ দিয়ে বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। অপূর্ব দীপ্তি স্ফুরিত হয়ে চলেছে সর্ব অঙ্গ দিয়ে। লীলাময়ী মা সমাধির গভীরতায় ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে বসে আছেন, ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবী, ভক্ত অভয়, কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের সেই লোকাতীত মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

সঙ্গীত শেষে মা মৃদু কণ্ঠে বলছেন,—দেখ ভক্তি ও সাধনার দ্বারা যদি উন্নত হতে চাও হবে অখণ্ডভাবে কীর্তন করা চাই। নাম। নামেই সবকিছু হয়।

আবার বলছেন, অমৃতের সন্ধান করো।

একজন ভক্ত বললেন, 'কোন্ পথে চলবো ?'

মা রসাশ্রিত করে বললেন, তোমরা দরজা বন্ধ করে আছ। রাস্তা কি করে দেখবে ? যে কোন প্রকারে দরজা খুলে ত বের হও। রাস্তা দেখা যাবে। সেই রাস্তায় চলতে থাক। দেখবে পথের সাথী তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় যাবে ? এই রাস্তা ঠিক নয়। ঐ রাস্তায় যাও। এই রকম হয়ে যায়। তুমি শুধু সেই লক্ষ্য ধরে চলতে থাকো। দেখবে কেহ না কেহ এসে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে যাবে। তোমরা শুধু যাবার চেষ্টা করতে থাকো। যতটুকু শক্তি করে যাও। সাহায্য পাবেই।

আবার বলছেন, দেখ, সংসার কি রকম জান ? যেন কাঁটার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছো। চারিদিকে কাঁটা লেগে যাচ্ছে। একদিক ছাড়াতে অন্যদিকে লাগছে। কিন্তু চেষ্টা করে চলেছো। তোমার এই অবস্থা দেখে একজন এসে তোমাকে সাহায্য করে কাঁটা ছাড়িয়ে বের করে দিলো। এই রকম হয়। তুমি চেষ্টা করতে থাকো, দেখবে সাহায্য মিলবেই।

গুরুপ্রিয়া দেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'মা, আজ তোমার মধ্যে বৈষ্ণবভাব প্রবল দেখছি কিন্তু।'

মাও মৃদু হেসে কাব্যায়িত করে বললেন,—বৈষ্ণব শক্তি কি ? নিজেই নিজেকে নিয়ে খেলা। আত্মারামের লীলা।

'সবই আরাম কিছুই নাই বেয়ারাম।'

এই ভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো সমস্ত দিন ধরে। বিন্ধ্যাচল আশ্রমগৃহে।

ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। আকাশের সুবর্ণ আভা গেলো

মিলিয়ে। নীরবে মা এসে বসলেন আশ্রমগৃহের বারান্দায়। অর্ধ-নিমীলিত চোখ। অনির্বচনীয় মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা। দৃষ্টি বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়। মা যেন মায়া উপকূলে বসে মায়ারই রহস্য উপলব্ধি করছেন।

সম্মুখের নির্জন উদাস প্রান্তর বনভূমি অন্ধকারে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। মাথার উপর নক্ষত্র-ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আর সেই অন্ধকারকে অপসারিত করে দূরে জঙ্গলের মাথায় ধীরে ধীরে উঠতে থাকে চাঁদ। আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিতে আশ্রমগৃহটি অপরূপ অপার্থিব এক সৌন্দর্যের মূর্তি ধারণ করে উদাস করে তোলে ভাবানন্দময়ী মা আনন্দময়ীকে। মা আবার হলেন ভাবস্থ। ভাবসমাধি।

ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হলো স্তোত্র। স্তোত্র নয় যেন অমৃতধারা নির্গত হলো মাতৃকণ্ঠ হতে।

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি
ওঁ শ্রদ্ধার্থানং শঙ্কটা উবাচ
নৈস্পৃংহ উগ্রতা নমে।
নরৌরূপ ভ্রমন্বয়েঃ
সং স্তিচং ভ্রূতপাঃ মহৎ মায়ায়াং
ইষ্টাসনা রুদ্রং পিবস্ব মে॥

শুভ্রবসনা মা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে মহিমময়ী মহেশ্বরীর মূর্তি ধারণ করলেন। সেই অলৌকিক মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্তবৃন্দ।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে এলো। মা শয্যা গ্রহণ করলেন। নিদ্রাদেবী এসে মা ও তাঁর ভক্তদের আচ্ছন্ন করলো।

বারো

'গোলাপ ফুল তোলাই উদ্দেশ্য, কাঁটার দিকে লক্ষ্যও করতে নেই।'

'কাহাকেও অবজ্ঞা করতে নেই। সাধুভাবে আছে এই দেখলেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়। সেই বিরাট মহানেরও এই একরূপ, এই ভেবে প্রণাম করবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে করবে। শ্রদ্ধার ভাবে যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। সকলের মধ্যেই সেই একেরই সত্তা দেখতে চেষ্টা করতে করতে 'দেখবে সেই বিরাট মহান ভাবে তাঁকে পাওয়ারই রাস্তার অনুকূল আশা।

ফিলটার করলে জল পরিষ্কার হয়। সেই শুদ্ধ জল যেমন এই জলেতে আছে, তেমন তিনি সর্বেতে আছেন। তাঁকেই প্রণাম। তাঁরই সঙ্গ করণীয়।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে।

ভক্ত কমলাকান্ত, অভয়, চিত্তরঞ্জনবাবু, নিবারণবাবু, উপেনবাবু, জিতেনবাবু, শঙ্করানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ আর গুরুপ্রিয়া দেবী মাকে ঘিরে বসে শুনছেন মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী। বাণী নয়— যেন অমৃত-রসধারা।

মা আবার বলছেন, সর্ব কর্মের মধ্যেই উদ্দেশ্যটা বড় রাখতে চেষ্টা করবে। ধ্যান যত বড় রাখবে ততই সেই জ্ঞান পাওয়ার আশা। তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন করো, আর আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধর—সিদ্ধকাম হবে।

নিজের গর্ব যত না করা যায় ততই মঙ্গল, আর আদর্শের গর্ব যত করা যায় ততই উন্নতির আশা।

অহংকার ত্যাগ করো, সৎ স্বরূপে অবস্থান করতে পারবে।

যেমন ফলের মধ্যে বীজ থাকে তেমনই বাসনা কামনারও বীজ

আছে। বীজযুক্ত ফলকে যেমন কত যত্নে সিদ্ধ করে ফেললে তবে তার ভিতরের বীজের বীজত্ব নষ্ট হয়, তেমনই সাধন ভজন দ্বারা বাসনার বীজ নষ্ট করে ফেলতে হয়।

মহাভাবরূপিণী রহস্যময়ী মা প্রাণহরা হাসি হেসে, মিষ্টি করে আবার বলছেন, 'সময়ের অপেক্ষা করা, আর তাঁরই ধ্যানে থাকা। একবার যদি সেই স্রোতে পড়তে পার, দেখবে তখন আর তোমার কিছুই করবার শক্তি নেই। স্রোতেই তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেই স্রোতে পড়বার জন্য তোমার যতটুকু শক্তি আছে তার উপযুক্ত ব্যবহার করো। যেমন মাটিতে হেঁটে তুমি নদীতে আসতে পারো, তারপর জলে নেমে সাঁতারও কাটতে পারো। এই ভাবে পথ চলে সাঁতার কেটে সেই স্রোতে গিয়ে একবার পড়লে, তখন আর তোমার কিছুই করবার নেই। স্রোতের প্রবল বেগই তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তাই বলা হয় তোমরা যে শক্তিটুকু পেয়েছো, ইহাও তাঁরই। সেই শক্তিটুকুর সদ্‌ব্যবহার করে স্রোতে পড়তে চেষ্টা করো।'

এই ভাবে শ্রীশ্রীমা লীলা করছেন ভক্তসনে। বিন্ধ্যাচল আশ্রমে। বিন্ধ্যাচল আশ্রম আবার প্লাবিত হয়ে উঠেছে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আগমনে। কীর্তনানন্দে। মিলনোৎসবের আনন্দে। কাশী, এলাহাবাদ, মির্জাপুর থেকে ভক্তরা এসে মিলিত হয়েছেন। নাম গান। কীর্তনের সমারোহ। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও ভাবের বিরাম নেই।

মির্জাপুর থেকে শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজী কয়েকজন ভক্তসহ এসেছেন। মাকে কীর্তন শোনাচ্ছেন। স্বামীজী গাইছেন। সুমধুর স্বরে অমৃত-নিস্যন্দী ভক্তিপ্লুত সুরে।

হরি রস মদিরা পিয়ে মন মানস মাত রে
একবার লুটহ অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদ রে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে,
নাচ হরি বলে দু'বাহু তুলে, হরি নাম বিলাও রে।

হরি প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে,
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে॥

কীর্তনে মার ভাব হলো। মহাভাব। অনন্তলীলাময়ী মা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ধারণ করলেন। মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো এক অপার্থিব দিব্যজ্যোতিঃ। নির্মল প্রশান্ত দৃষ্টি। যেন বিশ্বজননীর মূর্ত প্রকাশ। ভাবানন্দময়ী মায়ের ভাবের স্পন্দনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের প্রাণেও সৃষ্টি হলো ভাবান্তরের। এক বিরাট সত্তার স্পন্দন সমুদ্রের অন্তহীন বিপুল কলোচ্ছ্বাসের মতো ভক্তবৃন্দের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

লীলাময়ী মা আনন্দময়ী মিষ্টি হাসি হেসে বলছেন, 'অমি তো তোমাদের একটা পাগলী মেয়ে।'

এই পাগলী মেয়ের সকল চলাফেরার অন্তরালে, তাঁর চিরমধুর লীলাখেলার পশ্চাতে ভাগবতী শক্তির মূর্ত প্রকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মা যে আনন্দময়ী। তাইতো তিনি মঙ্গলময়ী। প্রেমময়ী। তাঁরই আনন্দে অনন্দময় হয়ে উঠেছে জগৎ সংসার। আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আনন্দ। ভগবান যে আনন্দময়। বিশ্বজননী আনন্দময়ী।

একজন ভক্তিমতী স্ত্রী জিজ্ঞেস করছেন, মা, মনটা স্থির ত হয় না। বরং ভগবানের নাম করতে বসলেই আরও যত বাজে চিন্তা আসে। শান্তি পাই না।

সুন্দর একটি উপমা দিয়ে মা বলছেন, দেখ না আয়নাটা সামনে রেখে যদি মুখখানা ঘোরাতে ফেরাতে থাকো, তবে কি কিছু দেখা যায়? কিন্তু যদি আয়নাটা সামনে রেখে মুখখানা স্থিরভাবে আয়নার দিকে রাখ, তবেই মুখের ভিতর, চোখের ভিতর, নাকের ভিতর সব জায়গায় কি কি আছে খুঁটিনাটি সব কিছু দেখতে পারবে। আয়নার ভিতর ফুটে উঠবে তোমার পরিষ্কার মুখচ্ছবিটি। আর শান্তি পাও না বল ত?

শান্তি কিসে পাবে? কাঁচা খাও কি না তাই তৃপ্তি পাও না।

ভাল করে পাক করে খাও তবে ত তৃপ্তি পাবে। পাক করতে হলেও প্রথমে হয়ত তরকারীটা কাটলে, তাতেও কিন্তু সিদ্ধ হল না। তবে ছোট ছোট হলো বটে। তারপর আগুনের উপর না চড়ালে সিদ্ধ হবে না কিন্তু। জল দিয়ে, মসলা দিয়ে, আগুনের উপর চড়িয়ে ঢেকে দাও তবে ত সিদ্ধ হবে। এবারে সেই সিদ্ধ জিনিস নামিয়ে খাও। তৃপ্তি-সহকারে খেতে পারবে। আনন্দ পাবে। আর ঐ আগুনের উপর বসিয়ে চলে গেলেই কিন্তু হবে না—অনবরত দেখতে হয়, আগুন ঠিক জ্বলছে কি না। না জ্বললে লকড়ি দাও।

এই বলেই মা মধুর হাসি হাসতে লাগলেন। হাস্যের উচ্ছলতায় বিষয়টি রস ও রহস্যে ভরপূর হয়ে উঠলো।

আবার কিছু সময় নীরব থেকে মা বলছেন, গাঁঠরী খোল, বহুদূর যানে পড়ে গা, এ'তো সব ধর্মশালায় আছ, আপনা ঘর ঢুণ্ডো। দেহ হতে প্রাণ চলে গেলেই শরীর পড়ে থাকবে। তখন কে কার? সব ঝুট, ঝুটত ফুটই জাতা হ্যায়।'

আসল কথা, তোমরা একটু কিছু করো। বেলা যে গেলো। অনেক রাস্তা যেতে হবে। নাম কর। নাম কর। নামেই সবকিছু।

'এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে,
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।'

নাম কীর্তন করতে করতে প্রেমের সঞ্চার হয়। পাপ নাশ হয়। প্রেমেই সকল চাওয়ার, সকল পাওয়ার শান্তি।

যেদিন তোমার তনুমালা নামমালা হয়ে উঠবে, সেইদিন তুমি অসীম প্রেমের আস্বাদ পাবে। সেদিন থেকে তুমি আর ক্ষণিক পার্থিব ভালবাসার মোহে মুগ্ধ হতে পারবে না। হৃদয়ের প্রেমকে ঈশ্বরে অর্পণ করবার জন্য আকুল হয়ে উঠবে। বৃন্দাবনের গোপিনীদের মতন আর কি। তখন আর সংসারের কোন কিছুতেই সুখ বা তৃপ্তি পাবে না। তাঁর মাধুর্যরসে ডুবে যাবে যে। সেই তো হলো শান্তি। অখণ্ড শান্তি।

তাই বার বার বলি নাম কীর্তন করতে। যে নাম ভাল লাগে সেই নামই কর। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক। নাম কীর্তন মানেই তাঁকে ডাকা। ভগবানে ডুবে যাওয়া।

শোনোনি সেই যে ঠাকুর হরিদাস বলেছিলেন,

'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।'

* * *

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর মুখনিঃসৃত অমৃতরসধারা পান করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন বিন্ধ্যাচল আশ্রমের ভক্তবৃন্দ।

তেরো

বসন্তের নূতন দিন। নূতন প্রভাত। নবোদগত সূর্যের আলোকে আঁধারে কালকাজী আশ্রমের পুণ্যময় ভূমিটুকু হয়ে উঠেছে সুস্পষ্ট। স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে বুনো ফুলের মিশ্রিত গন্ধ। বিহগকুল অবিশ্রান্ত কলরব কূজন করছে। অপূর্ব রমণীয় সে প্রভাত। স্বপ্নে-ভরা বিচিত্র সেই প্রভাতকালে মা আনন্দময়ী পদার্পণ করলেন কাল-কাজীর আনন্দময়ী আশ্রমের জমিতে। বারাণসীধাম থেকে অকস্মাৎ মা চলে এসেছেন দিল্লীতে। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠেছে দিল্লী। দিল্লীর ভক্ত হৃদয়। দলে দলে আসছে ভক্তেরা। সব মাকে দেখবে। মা'র চরণ দু'খানি। চরণেই যে শাশ্বতী স্থিতি। শুধু তাই নয়, প্রণাম করবে। পূজা করবে। আর শুনবে শ্রীমুখের কথা।

মা আনন্দময়ী জগজ্জননী নিত্যতৃপ্তা অন্নপূর্ণা শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন। কে আছিস দৈন্যার্তিভীত, ভবতাপপীড়িত—শান্ত হবি আয়। তৃপ্ত হবি আয়। অমল হবি আয়। আরোগ্য স্নানে। কালকাজীর আশ্রমে। এ যেন ক্ষীরোদসাগরের লক্ষ্মী উঠেছেন

সংসারসাগরের মন্থনে। কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধারাণী আবির্ভূতা হয়েছেন কালকাজীর আশ্রমে। দুঃখদুর্গতিহরা বিমুক্তি-ফলদায়িনী। প্রাণমন্ত্ররূপিণী। জলজীয়ন্ত মা। জ্যান্ত মা। সকলের মা। ভক্তের মা। বিমুখেরও মা। বান্ধবের মা। বৈরীর মা। সতের মা। অসতের মা। বর্তমানের মা। ভবিষ্যতেরও মা। মধু মধুরা পরম-যোগিনী আনন্দময়ী মা।

মা ভক্তসনে লীলা করছেন। সকলের সঙ্গেই শিশুর মত মা, বাবা ডেকে কথা বলছেন। আনন্দ দিচ্ছেন।

একজন ভক্তিমতী স্ত্রী ছল ছল চোখে বললেন, 'আচ্ছা মা, তোমার জন্য যে আমাদের প্রাণে কি রকম অস্থিরভাব হয় তা কি তুমি বোঝ না?'

আবার একজন স্ত্রীভক্ত বলছেন, মা গো, এ যে দেখছি গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা।

ভক্ত দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করছেন,—মা, উপনয়নের পর হতেই ত সন্ধ্যা-আহ্নিক করছি। একটু একটু বসি কিন্তু কিছু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। আফিসে যে পদ বৃদ্ধি হচ্ছে তার অর্থ অফিসের চিন্তা বেশী করতে হচ্ছে। কি হলো মা!

প্রত্যুত্তরে মা হেসে হেসে বলছেন,—দেখ, তোমরা ঔষধ খাও সত্য, কিন্তু কুপথ্য কর, তাই ঔষধে ফল দেখা যায় না। ঔষধ হলো নাম। পথ্য হলো সংযমাদি। কুপথ্য করলে কি রোগ আরাম হয়? যতই ঔষধ খাও ফল দেখা যায় না। শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রেখে নাম করে যাবে। নামেই সব হবে।

মায়ের স্নেহবারি ভরিত স্পর্শ, প্রেমতরল চোখের দৃষ্টি আর শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে করলো অভিভূত।

একজন স্ত্রীভক্ত অভিভূত হয়ে বলছেন, 'মা, আমি গোপালকে বড় ভালবাসি। সেই মূর্তিই আমি চিন্তা করি। যেদিন থেকে তোমায় সিমলায় দেখেছি, তারপর থেকেই আমি জপে বসলে ধ্যান আসতেই

তোমার মুখখানিই কেবল দেখতে পাই। আর শরীর দেখি না, মা। আমি বাইশ বৎসর যাবৎ গোপালের সেবা, ধ্যান করছি, এখন এরূপ হয়ে গেলো কেন? মা, তুমি কি আমার গোপাল? আমি যদি গোপালের দুধে চিনি না দেই, ভিতর হতে আসে—তুমি চিনি দাও নাই। চিনি দাও। এখন এ কি হলো মা? মাগো! বল বল মা তুমি কি? তুমি কে?'

মা বললেন, গভীর স্নিগ্ধ সহজ সুরে,—তুমি যা বলো, মাগো। আমি তাই।

অমনি সেই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটি অভিভূত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। অশ্রু ঝরতে লাগলো তাঁর দু চোখ বেয়ে।

এ অশ্রুর আস্বাদ কি দুঃখ, না সুখ, কে বলবে?

অবশেষে শুরু হলো কীর্তন। নাম গান। কৃষ্ণগুণগান। কালকাজীতে ভবিষ্যতের আনন্দময়ী আশ্রমে।

ভক্ত অভয় গান ধরলেন,

গোপাল বল, গোবিন্দ বল

রাধা রমণ হরি, গোবিন্দ বল।

কৃষ্ণ কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠলো দিল্লী। পরবর্তী কালে আশ্রমগৃহ নির্মিত হলে ১৯৫৪ সালের ২৬শে আগস্ট শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীহরিবাবাসহ কালকাজী আনন্দময়ী আশ্রমের গৃহে প্রথম প্রবেশ করেন। এবং মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান।

* * *

মহাষ্টমীতে মা পূর্ণ করলেন ভক্ত-মনোবাঞ্ছা। ভক্তরা ১০৮ পদ দিয়ে মায়ের ভোগ দিলেন।

ভক্ত দুর্গাদাসবাবু বললেন,—'মা আমাদের সপ্তমীতে বাসন্তী। অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা। আর নবমীতে শ্রীরামচন্দ্র।'

ওদিকে মন্মথবাবু মায়ের পূজা ঘটে করছেন। ভক্ত সমাগমেরও নেই বিরাম। দেরাদুন, সিমলা, মীরাট ও বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তেরা

এসে একত্রিত হয়েছেন। দিল্লী আবার প্লাবিত হয়ে উঠেছে মায়ের আগমনে। আনন্দময় হয়ে উঠেছে দিল্লীর আকাশ বাতাস।

ভক্তপ্রবর শ্রীযুত অমল সেন, ডাঃ জে. কে. সেন, পঞ্চুবাবু, দুর্গাদাসবাবু, চারুবাবু, সিধুবাবু, অনাদিবাবু, রায়বাহাদুর সতীশ বিশ্বাস, মন্মথবাবু ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ পূজান্তে জ্যান্ত মায়ের পায়ে দিলেন অঞ্জলি। ভাবানন্দময়ী মা আনন্দময়ী ভাবে বিভোর হয়ে ভগবতীর মূর্তি ধারণ করলেন। ঠিক যেন বসন্তকালের বাসন্তীমূর্তি। সেই নম্র, স্বর্ণাভা, সেই স্থির নির্মল প্রশান্তি। সমস্ত আননমণ্ডলে এলো এক লোহিত লাবণ্য। প্রতিমার মুখে যেমন রক্তদ্যুতি থাকে, তেমনি। যারা যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আর যাদের ছিল সেই অমিয় সৌভাগ্য তারা দেখলো, জানলো, চিন্‌লো ধারাবারিসমা করুণাকে। শিবভাবিতা অনন্তমায়াকে। মাধুর্যময়ী কৃপাসাগরী মা আনন্দময়ীকে। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মাকে।

ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা। বসন্তের মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলে···মানুষের মনে এনে দেয় পরমানন্দের আবেশ। জাম দেবদারু গাছের সুউচ্চ শাখাগুলি যেন ভবিষ্যতের আশ্রম বাড়ির পানে আত্মপ্রসারিত করে রয়েছে। কী যেন ওরা শুনছে কান পেতে। সন্ধ্যাটি কি মধুর! শান্তিময়!

নাম গান শুরু হলো। রায়বাহাদুর সতীশ বিশ্বাস মাকে কীর্তন শোনাচ্ছেন। তিনি হরনাথ ঠাকুরের শিষ্য। মা আনন্দময়ীর পরম ভক্ত।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভক্তরাও নাম ধরলেন,

—হরি হরয়ে নমঃ
কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ
কৃষ্ণ কেশবায় নমঃ

কীর্তনে মা'র ভাব হলো। ভাবোম্মাদনায় মত্ত হয়ে, গৌরাঙ্গ-

মহাপ্রভুর মত দু'হাত তুলে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন। সারা দেহ ভূমানন্দে ঢল ঢল। পলকহীন প্রশান্ত নেত্র। মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। জ্যোতির্ময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মূর্তি ধারণ করলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। অভাবনীয় অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

* * *

'যেমন তুমি আমি আছি, তেমন ঈশ্বরও আছেন। তাঁর মাধুর্যের রসে ডুবে যাও, আপনার জন বলে মনে হবে। ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না। ভগবান যে ভক্তের কাছে বাঁধা পড়েন।'

মা বলছেন একজন ভক্তকে।

ভক্তটি জিজ্ঞেস করছেন,—আসল কথা বলুন ঈশ্বর আছেন কিনা?

কীর্তনান্তে ভক্তরা মাকে ঘিরে বসেছে। শ্রীমুখের কথা শুনবে বলে।

কীর্তন হলো মায়ের ভক্ত সুকুমার বোস I. C. S.-এর মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে। সুকুমারবাবুর জননী শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী (বেবীদি) মায়ের পরম ভক্ত। মা নাম দিয়েছেন গৌরীপ্রিয়া।

গৌরীপ্রিয়াও মুগ্ধ হয়ে মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শুনছেন। পুত্রশোকও ভুলেছেন। আনন্দময়ীর অবস্থানে আনন্দধামে পরিণত হয়েছে দিল্লী। জগতের ঈশ্বর যে আনন্দময়। জগৎমাতা আনন্দময়ী। তাঁর নাম যে আনন্দ। আনন্দরূপেই তাঁকে আমরা খুঁজবো। উপাসনা করবো। আনন্দ হতেই সর্বভূত জাত। আনন্দের জন্যই তারা বর্তমান। আনন্দই তার বৃদ্ধির মূল। আবার আনন্দেই তারা প্রয়াণ করে। সেই সচ্চিদানন্দই আমাদের খাঁটি সত্তা। সৎই চৈতন্য। চৈতন্যই আনন্দ। এই আনন্দের অনুভূতিতে গভীর প্রসন্ন প্রশান্ত আত্মসত্তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তিনিই পরমপুরুষ। পরম-যোগিনী জগৎমাতা। স্বয়ং ভগবান। আমাদের অন্তরস্থিত তাঁরই আত্মজ্যোতি আমরা অবলোকন করি। তিনি সুখে দুঃখে, ভ্রান্তি ও

গৃহবধূ। একমাত্র পুত্র মাখনের জননী ছোট্ট নির্মলার গর্ভধারিণী জননী। আর আনন্দময়ী মায়ের ভক্তদলের দিদিমা মোক্ষদাসুন্দরী, আজ গেরুয়া বসন পরিধান করে হলেন সন্ন্যাসিনী। চিরসন্ন্যাসিনী মুক্তানন্দ গিরি। মুগ্ধ বিস্মিত আর অভিভূত হয়ে ভক্তবৃন্দ সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

আনন্দময়ী মা মোক্ষদাসুন্দবীকে সন্ন্যাসিনীর বেশে সাজিয়ে বললেন, 'দিন দিন লোকে সংসারে জড়িয়ে পড়ে। কয়জনের ভাগ্যে ঐবকম বাহিব হওয়া হয়? এখন শুধু সেই একের, সেই প্রেমময় ভগবানেব চিন্তাতেই থাকতে চেষ্টা কব। জ্ঞান ও স্বরূপ লাভ না হলে কিছুই হলো না।'

তারপর মধুব কণ্ঠে মা গান ধবলেন,

সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম ভজ মন।

*　　　*　　　*

মা আবার বেরিয়ে পড়লেন তীর্থে। উত্তর কাশীর পথে। সঙ্গে ভক্ত কমলাকান্ত, অভয়, রুমাদেবী, গুরুপ্রিয়া দেবী, অখণ্ডানন্দজী, কানু, শিশির আর খেরেশ।

তুই দিকের তুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরে যাত্রা হলো শুরু। পথেব পর পথ পেরিযে। তুর্গম গিরি বনভূমি প্রান্তর অতিক্রম করে, 'বলডিয়ানা' ছাড়িয়ে মা ভক্তবৃন্দসহ চলেছেন। কখনও ডাণ্ডিতে। কখনও পদব্রজে। শৈলমালা-বেষ্টিত পথের গভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে মা কৃষ্ণনামে মুখরিত করে তুললেন আকাশ-বাতাস।

হিমালয়ের বন-বনানী। বন্য ফুলশোভা। পাখীর কূজন। ঝরণার কল-মর্মর। নির্জনতা। গম্ভীর সৌন্দর্য আর নীরব রহস্য মানুষের মনে এনে দেয় অদ্ভুত গভীব এক শান্তি। আনন্দ। পরমানন্দ। আর সৃষ্টি কবে উদাস চিন্তার। তপস্যা ও মহাজিজ্ঞাসার এই পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে ভাবময়ী মা আনন্দময়ীও মহাভাবে হলেন বিভোর।

প্রেমময়ের তৃষ্ণায় বিভোর। কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি-বরদানের কর্তা শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভাব।

সকাল গেল। দুপুর গেল। সন্ধ্যাও হয়ে এলো নিবিড়। ভক্তদলসহ মা এসে পৌঁছুলেন ধরাসুতে। উনিশে বৈশাখ, তেরশো ছেচল্লিশ সাল।

পবিত্র শীতলজলপ্রবাহিণী গঙ্গার ধারেই চটী। মনোরম স্থান। অমিয় সৌভাগ্যবান ভক্তদল মহানন্দে এই চটীতেই শ্রীশ্রীমা'র জন্মোৎসব কবলেন প্রতিপালন। পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্না ফুট-ফুট করছে। মনে হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কে যেন পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা দিয়েছে সাজিয়ে। মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র গঙ্গার তীরে মায়ের পূজা হলো শুরু। বন্য ফুলের সুবাসে গঙ্গার তীর ভরপূর। ভক্ত কমলাকান্ত ও অভয় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে নিয়ে এলেন বিল্বপত্র ও বন্যফুল। গুরুপ্রিয়া দেবী বসলেন মাতৃপূজায়। সে এক পরম বিচিত্র মুহূর্ত। মহাভাবানন্দময়ী মা ভাবস্থ হয়ে, জ্যোতির্ময়ী অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি ধারণ করলেন। এ তো আর মানবী মূর্তি নয়। দেবী মূর্তি। এমন রূপ একমাত্র পার্বতীরই ছিল। আর ছিল শ্রীমতীর। প্রেমপাগলিনী রাধারাণীর। তাই তো ভোলানাথ হলেন 'রমা পাগলা' আর স্বয়ং শিব হলেন ভোলানাথ।

ক্রমে ক্রমে রাত্রিও হয়ে এলো গভীর। অবশেষে মা শয্যা গ্রহণ করলেন। হিমালয়ের সেই শান্ত, নিস্তব্ধ, স্বপ্নময় পরিবেশের মধ্যে নিদ্রাদেবী এসে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

আনন্দ-আবেশের পরম শান্তিপূর্ণ সেই রাত্রিরও হলো আবার অবসান।

অন্ধকারের আবরণ ছিন্ন করে নব উষার হলো উদয়। ধীরে ধীরে আলোয় আকাশ হয়ে উঠলো আলোকিত। পর্বতের চূড়ায় জমায়িত মেঘের উপর সূর্যের আলো পড়ে রূপোর মত জ্বলতে লাগলো।

অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় শোভিত হয়ে উঠলো হিমালয়। মহিমময় হিমালয়।

আবার শুরু হলো পদযাত্রা। গঙ্গার তীরে তীরে পথ। চারিধারে উঁচু উঁচু শৈলচূড়া। মাথার উপর বৈশাখের মেঘে ভরা আকাশ। আশেপাশে ঘন অরণ্যানী। গম্ভীর নিস্তব্ধতা। লোকপাবনী গঙ্গার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গম্ভীর নিস্তব্ধতাকে আরও যেন বাড়িয়ে তুলেছে। অপূর্ব গম্ভীর শোভা এই উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ে। গম্ভীর সৌন্দর্যমণ্ডিত, রহস্যময় এই হিমালয়। যুগ যুগ ধরে এই গিরি-নদী-অরণ্যসঙ্কুল হিমালয় এক রকমই আছে।

সেই বহুকাল আগে তমসাতীরের পর্ণ কুটিরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখতে লিখতে চমকে উঠে যেদিন দেখেছিলেন সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী সেদিনও হিমালয় এমনই ছিল। সুদূর অতীতে বুদ্ধদেব যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেছিলেন, চৈতন্যদেব যেদিন মহাভাবে বিভোর হয়ে শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেছিলেন, সেদিনও এই হিমালয় এই বনানী ঠিক এমনই ছিল। আর যেদিন মহাকবি কালিদাস মেঘদূত রচনা সমাপ্ত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন, সেদিনও এই হিমালয় এই অরণ্যানী গম্ভীর সৌন্দর্য নিয়ে আজকের মতই স্তব্ধ হয়ে এমনই ভাবে ছিল দাঁড়িয়ে। শত শত সাধকের সাধনার পুণ্যভূমি মহিমময় এই হিমালয়। রহস্যময়ী মা আনন্দময়ী রহস্যময় এই হিমালয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে ভক্তদলসহ পথ চলতে লাগলেন। ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। অন্ধকারও দেখা দিল।

মা এসে পৌঁছুলেন উত্তর কাশীতে। উত্তরাখণ্ডের কাশীতে। শিবের লীলাভূমি আর সাধকদের তপোবন এই উত্তর কাশী। তাই তো মা এখানে স্থাপন করেছেন কালীমূর্তি। কালিকা দেবীর মন্দির। ভক্তদল নিয়ে মা উঠলেন এই মন্দিরে। মা আনন্দময়ীর আগমনে উত্তর কাশী আবার হয়ে উঠলো প্লাবিত। দিকে দিকে

প্রচারিত হলো মায়ের আগমন সংবাদ। ছুটে এলেন সকলে। স্ত্রী, পুরুষ, সাধক, ভক্ত, শিশু, বৃদ্ধের দল।

আর এলেন মায়ের ভক্ত সাধক সিদ্ধপুরুষ স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি। স্বামী দেবীগিরি মহারাজার শিষ্য। শ্রীশ্রীমায়ের মরমী ভক্ত। মহানন্দে মাকে সাষ্টাঙ্গে করলেন প্রণাম। মায়ের আদেশেই তিনি এই উত্তর কাশীতেই সাধন ভজনে নিরত। নির্বিকার মহাপুরুষ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি মাতৃনামে হয়েছিলেন বিভোর। পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিবাস হলো ঢাকা জেলার বিক্রমপুরান্তর্গত কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম)। পিতা শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। সর্বদা মেতে থাকতেন হরিনামে। মাতাও ছিলেন ভক্তিমতী স্ত্রীলোক। সর্বদা দেবসেবা নিয়ে থাকতেন। পিতা মাতা এমন না হলে কি আর এমন পুত্র জন্মায়! হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে মা বলেছিলেন স্বামীজীকে—এতদিন কোথায় ছিলে? তোমাদের জন্যই ত এ স্থান। উত্তর কাশী যাবে?

স্বামীজীও মহাভাবময়ী মা আনন্দময়ীর জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি অবলোকন করে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে চলে আসেন উত্তর কাশীতে। সেই থেকে শীতে গ্রীষ্মে সমান দিগ্বসন হয়ে মাতৃসাধনায় হলেন নিরত। পরবর্তীকালে মা বলেছিলেন, তাঁর মত ভক্ত কে? এঁরা সব ঐভাবে এসেছেন। ভক্ত হওয়া কি কম কথা! ভক্ত কি অমনিই হয়? মুক্তির চেয়েও ভক্তি বড়। ভক্তি সব কিছুর চেয়েই বড়।

এই স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজের পুত্রই শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আনন্দময়ী মায়ের মরমী ভক্ত। মায়ের স্নেহধন্য চিত্ত।

এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো উত্তর কাশীতে। ভগবানের সেই শুদ্ধ প্রীতিময় লীলাবিলাস। অবশেষে লীলাময়ী মা ভক্তমণ্ডলীকে নিয়ে মেতে উঠলেন নামগানে। উদয়াচল কীর্তন চললো। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও ভাবের বিরাম নেই। ভাবে ঢুলু ঢুলু। মহাভাবে আত্মহারা হয়ে যেন আনন্দ বিগ্রহের প্রীতিরস

আস্বাদনে নিরত। হরি হরে ভেদ নেই এই তত্ত্বই শ্রীশ্রীমা প্রচার করছেন শিবের লীলাভূমিতে হরিনামগানে ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে। তারপর সদ্য গড়ে ওঠা উত্তর কাশীর এই আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে রহস্যময়ী মা হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়লেন দূর দুর্গমের উদ্দেশে। গঙ্গোত্রীর পথে।

আবার শুরু হলো পথচলা। চলার আর শেষ নেই। পথেরও নেই শেষ। পথের পর পথ পিছনে ফেলে মা এগিয়ে চলেছেন সম্মুখের দিকে। পথ ভয়ানক দুর্গম। মা হাঁটছেন। ভক্তদলও হাঁটছেন। ক্লান্তি নেই। নেই অবসাদ। আর আকাশের বুকে এগিয়ে চলেছে মেঘগুলো, আনন্দ করতে করতে। তারই ছায়া এসে পড়েছে পথের উপর। কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার কখনও যাচ্ছে দেখা। লীলাময়ী মায়ের সাথে মেঘেরাও দিয়েছে খেলা শুরু করে। এইভাবে মা জনমানবশূন্য দুর্গম পথ, পাহাড়, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমি অতিক্রম করে ভাটিয়ালী, গাঙ্গানানী ছাড়িয়ে মহাভাবে বিভোর হয়ে এসে পৌঁছলেন ধরালীতে। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা আরও মনোরম। এই স্থানকে প্রকৃতি সাজিয়েছে অজস্র সম্পদে। অবর্ণনীয় শোভা। বৃক্ষলতা, বন্যজন্তু পাখীদের আশ্রয়স্থান, আর মহান সাধুদের তপোভূমি এই ধরালী। এই মহিমময় হিমালয়।

মায়ের আগমন সংবাদে ছুটে এলেন স্থানীয় লোকেরা। হিমালয়ের ন্যাংটা সাধুরা আর এলেন পরম যোগী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। পরিধানে ভূর্জপত্রের ছোট্ট নেংটি। উলঙ্গ প্রায়। শীত গ্রীষ্ম তিনি এইভাবেই থাকেন। তিন চার ঘণ্টা গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। যখন বরফ পড়ে তখনও নিয়মের হয় না ব্যতিক্রম। সব কিছু শুনে মা ভক্তদের বললেন, 'ধৈর্য এবং সহ্য সাধনার মেরুদণ্ড।'

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো নিশীথের অন্ধকার। আবার সেই অন্ধকার। আকাশের মেঘ কেটেও দিনের আলো ফুটে উঠতে দেরী হলো না। নির্মল নীলাকাশে ফুটে উঠলো প্রভাতের সূর্য। প্রভাতের

সেই উজ্জ্বল আনন্দময় দিনটিতে মা আনন্দময়ী ভক্তদলসহ আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলের পথ ভেঙে মা চলেছেন দুর্গমের পথে। গঙ্গোত্রীর পথে।

ভৈরবঘা ছাড়িয়ে অবশেষে মা ভক্তদলসহ এসে পৌঁছুলেন দশ হাজার ফিট উচ্চে গঙ্গোত্রীতে। নির্জন স্থান। এ স্থানের নির্জনতা সুগম্ভীর নির্জনতা, হিমালয়ের সৌন্দর্যকে করে তুলেছে গাম্ভীর্যময়। বিশাল নির্জন হিমালয় আর তার অরণ্যভূমি মানুষের মনে এনে দেয় অপূর্ব শান্তি। পরমানন্দের আভাস। সাধকের তপোভূমিতে পদার্পণ করে ভাবময়ী মা আনন্দময়ীও মহাভাবে হলেন বিভোর। সেই জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন হিমালয়ের ন্যাংটা সাধুরা, মহা মহা ঋষিরা। আর মহানন্দে ছুটে এলেন ভক্তপ্রবর সিদ্ধপুরুষ স্বামী পরমানন্দ। ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শিষ্য পরমানন্দ স্বামী। মা আনন্দময়ীর ভক্ত। মায়ের নামে আত্মহারা। পাগল। মায়ের আদেশে ইনিও উত্তর কাশীর কালীমন্দিরে কিছুদিন করেছিলেন সাধনা। শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে করলেন প্রণাম। মা গ্রহণ করলেন পরম যোগী পরমানন্দ স্বামীর প্রণাম। মা আনন্দময়ীকে দর্শন করে, মায়ের পদযুগল স্পর্শ করে আর মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতরসধারা পান করে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন স্বামী পরমানন্দ আর অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তদল। এই পরমানন্দ স্বামীই পরবর্তী কালে মায়ের অন্যতম পার্ষদ হয়ে মায়েরই সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন।

শ্রীশ্রীমা উঠলেন গঙ্গাতীরের কালীকম্বলী বাবাজীর ধর্মশালায়। পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলস্রোত বয়ে চলেছে কুলকুল করে। শান্ত স্তব্ধ দিগন্তলীন হিমালয়। সুপ্রাচীন হিমালয় আর তার বনানী। সৌন্দর্যে অতুলনীয়। অদ্ভুত নীল আকাশ। আর পর্বতশিখরে জমায়িত হয়েছে ঘননীল মেঘপুঞ্জ। নবনীল নীরদমালা। আবার একখণ্ড লঘু মেঘ অস্তদিগন্তের রঙে রঞ্জিত হয়ে কি অপরূপ শোভাই না করেছে ধারণ।

এই অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যভূমিতে এসে মা বসলেন ভক্তবৃন্দসহ। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। বন্যফুলের গন্ধে ভরা নিস্তব্ধ সে সন্ধ্যা। লীলাময়ী মা লীলা করছেন ভক্তসনে। তখন গাছের বড় বড় পাতার আড়ালে জ্বলজ্বল করছে শুক্র ও বৃহস্পতি। কি অনির্বচনীয় সে পরিবেশ! সর্বসৌন্দর্যনিলয়া আনন্দময়ী মা গঙ্গাকে দেখিয়ে ভক্তদের বলছেন, 'সেবা হলো পুষ্প। অনুরাগ চন্দন। বিল্ব-পত্র প্রেম। আর ভক্তিই হলো গঙ্গাবারি।'

গঙ্গার ওপারে ছোট্ট কুটিরে থাকেন একজন সাধু। উলঙ্গ। মৌনী। নাম কৃষ্ণাশ্রম। পরমযোগী। সিদ্ধপুরুষ। শীত গ্রীষ্মে একই ভাবে সাধনা করছেন। তীব্র শীতে যখন বরফ পড়ে তখনও তাঁর নিয়মের হয় না কোনও ব্যতিক্রম।

বিহগ কূজনে আর লোকপাবনী গঙ্গার কলকল্লোলে মহাত্মার কুটীর মুখরিত। হিমালয়ের স্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে সে অদ্ভুত সুর, সুর নয় যেন ঈশ-গুণগান, মানুষের মনে এনে দেয় পরম শান্তি। পরমানন্দ। স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই অতীতের মুনি-ঋষিদের কণ্ঠনিঃসৃত সামগানের কথা। ভগবানের অস্তিত্বের কথা।

ধীরে ধীরে রক্তিম রাগ-রঞ্জিত তরুণ তপন পূর্বাকাশে তাঁর প্রথম স্বর্ণরশ্মি শৈলশিখর, অরণ্যানী আর এই মহাত্মার কুটীরে দিলেন ছড়িয়ে। পরম পাবনি মা আনন্দময়ী অকস্মাৎ এসে হাজির হলেন স্বামীজীর কুটীরে। জগজ্জননী দর্শন দিলেন আপন সন্তানকে। মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমকে। নবসূর্যবিনিন্দিত দিব্য জ্যোতিষ্মান এক তপস্বীকে। জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন স্বামীজী। মস্তক অবনমিত হলো। প্রণাম করলেন জগৎমাতাকে।

পুণ্যভূমি গঙ্গোত্রীতে পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা দুইদিন অবস্থান করে আবার ফিরে চললেন উত্তর কাশীর পথে।

পনেরো

রাজার নাম লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজধানীর নাম সুকেত। পর্বতময় সুকেত রাজ্য। চতুর্দিকের উচ্চ পর্বতমালায় সুরক্ষিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মনোরম। প্রকৃতিরাণী যেন সর্বদাই হাস্যময়ী মনোমুগ্ধকর মূর্তিতে বিরাজিতা।

আর এই তো সেই গুহা। এখানে ঠিক এইখানেই সেই সুদূর অতীতে যিনি তপস্যা করেছিলেন তাঁর নাম শুকদেব। ভগবান বেদব্যাসের পুত্র। সেই শুকদেবের তপস্যার গুহা। তাই তো তাঁরই নামানুসারে এ রাজ্যের নাম হয়েছে সুকেত। সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ এক পথ রয়েছে গুহার মধ্য দিয়ে। শুকদেব প্রতিদিন সেই পথ দিয়ে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। আর ঐ তো সেই কুণ্ড। শুকদেবের সৃষ্ট কুণ্ড। গঙ্গাস্নান করে এখানে এসে শুকদেব তাঁর ধুতি নিংড়িয়ে ছিলেন, সেই থেকে এই কুণ্ড। জতুগৃহ পুড়ে যাবার পর মাতা কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবও এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন এই গুহায়। সেই সময় একদিন যখন কুন্তীদেবীর উপর পাহাড় ধ্বসে পড়ছিলো, তখন ভীম হাত দিয়ে সেই পাহাড় ধরে রেখেছিলেন। সেই হাতের চিহ্ন আজও আছে। ঐ তো রয়েছে স্পষ্ট হয়ে সেই পাঁচ আঙুলের দাগ। রাজা দেখাচ্ছেন শ্রীশ্রীমাকে। মাও ঘুরে ঘুরে দেখছেন সবকিছু। আর মৃদু মৃদু হাসছেন। রাজা ও রাণী উভয়েই মায়ের ভক্ত। সাদরে আহ্বান করে মাকে নিয়ে এসেছেন নিজ রাজধানীতে। সুকেতে। বহু সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্য মিশে রয়েছে এই শুকদেবের তপোভূমি সুকেতের মাটিতে। পাঠানকোট থেকে একশত পঞ্চাশ মাইল আঁকাবাঁকা গিরিপথ দিয়ে মা ভক্তদল সহ এসেছেন সুকেতের এই পবিত্রভূমিতে।

ধীরে ধীরে নিভে এলো অপরাহ্ণের আলো। দেখা দিল সন্ধ্যা। আলোকিত হয়ে উঠলো রাজপ্রাসাদ। আলো ঝলমল করে মহামায়ার মন্দিরে। আর জল টলমল করে গঙ্গা-যমুনা কুণ্ডে।

স্বপ্নাদিষ্টা হয়েছিলেন সুকেতের রাণী। ভগবতী রাণীকে স্বপ্নে বলেছিলেন, 'তুই আমার সেবা কর্। তোর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। রাজ্যের মঙ্গল হবে।' রাজা শুনলেন সবকিছু রাণীর নিকট হতে। অবশেষে রাজার নির্দেশে নির্মিত হলো মহামায়ার মন্দির। স্থাপিত হলো দেবী মূর্তি। দশভুজা দুর্গার মূর্তি। দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবসে যে ঘৃত-প্রদীপ জ্বেলেছিলেন রাজা, সেই দীপ অনির্বাণ শিখা বিস্তার করে আজও জ্বলছে। এই মহামায়ারই করুণায় রাজা লাভ করলেন একটি পুত্র সন্তান।

সেই জাগ্রত মহামায়ার মূর্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন মা আনন্দময়ী। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে। নীলবরণ স্নিগ্ধ জ্যোতির্লেখার মত ঐ বিদ্যুতের চকিত স্পর্শে বিচিত্র এক প্রভায় দীপ্ত হয়ে উঠলো মা আনন্দময়ীর মুখমণ্ডল। যেন কোটি-চন্দ্র-সুশীতল ও কোটি-সূর্য-সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী দেবী মহাদেবীর মুখমণ্ডল। এ যেন মন্দিরের দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন মন্দির প্রাঙ্গণে। শ্রীশ্রীমায়ের সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে বিস্মিত ও অভিভূত হলেন সপারিষদ রাজা ও অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তদল। রাজা ভাবে বিভোর হয়ে মা মা বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন জগজ্জননীকে। ভক্তবৃন্দও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধন্য হলেন।

অবশেষে মন্দিরে জ্বলে উঠলো আরতির দীপ। গন্ধ প। সুরভিত হলো বাতাস। শুরু হলো আরতি। দেবী মহাদেবীর আরতি। সেই সঙ্গে হলো জ্যান্ত মা'রও আরতি। রাজপুরোহিতের সঙ্গে ভক্তপ্রবর রাজাও মা আনন্দময়ীর আরতি করলেন। আর ভাবে বিভোর হয়ে ভক্ত হরিরাম যোশী স্তোত্র পাঠ করলেন। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

শ্রীশ্রীমা রাজার ভক্তিভাব দেখে বললেন, 'সেই একেরই ধ্যানে থাকতে চেষ্টা কর। মূলে না গেলে ত ফল পাওয়া যায় না। আর ফল একদিন পাবেই।'

মা স্থকেতে এক সপ্তাহ অবস্থান করলেন। তারপর অকস্মাৎ স্থকেতের লীলা সাঙ্গ করে ভক্তদলসহ মা এলেন বৈজনাথে। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে তারামায়ের মন্দিরে ৺তারামূর্তির প্রতিষ্ঠা হলো। সেও অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য। তারানন্দ স্বামী মা আনন্দময়ীকে ৺তারামূর্তিতে নয়নগোচর করে অভিভূত হয়ে প্রণাম করলেন। মায়ের আগমনে প্লাবিত হয়ে উঠলো বৈজনাথ। দলে দলে গ্রামবাসীরা এসে মাকে দর্শন করলো আর প্রণাম করলো শ্রীচরণ-কমলে। স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা আপনজনের মত মা'র দেহ স্পর্শ করে কথা বলতে লাগলো। মাও তাদের সঙ্গে মিলে মিশে নানারকম কৌতুক করে কথা বলতে লাগলেন। মায়ের প্রাণের স্পর্শে সকলেই হলো তৃপ্ত। কথাচ্ছলে মা সকলকেই বললেন, 'এক চিন্তায়, এক লক্ষ্যে যত বেশী সময় দিতে পারো, দেবে। দিনগুলি বৃথা কাটাইও না। যখন যা করা, মন প্রাণ দিয়ে করতে হয়।'

অবশেষে মা ভক্তদলসহ এলেন জ্বালামুখীতে। জ্বালামুখী তীর্থে গিরিনিঃসৃত বহ্নিশিখা দর্শন করে ভক্তদল অভিভূত ও বিস্মিত হলেন। মাও ভাবানন্দে বিভোর হলেন। ভক্তদের প্রাণও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠলো। এইভাবে সমস্ত রাত্রি অতিক্রান্ত হলো। ধীরে ধীরে উদয় হলো প্রভাত-সূর্যের। প্রভাতের সোনালী আলো ঝলমল করতে লাগলো মন্দিরের উপর। অপরূপ শোভায় শোভিত হয়ে উঠলো মন্দির।

মা এই ভোরের বেলায় আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। পথ আর পথ। পথের পর পথ। মা'র চলারও নেই শেষ। আঁকাবাঁকা গিরিপথ দিয়ে মা চলেছেন। এসে পৌঁছুলেন ফ্যাংড়াতে। ফ্যাংড়ার পীঠস্থান দর্শন করে মা এলেন পাঠানকোটে। পাঠানকোট থেকে অমৃতসরের পথে রওনা হলেন। ট্রেনে।

মা ভক্তদলসহ চলেছেন। অমৃতসরে। শিখদের মহৎ অমৃতময় 'গুরুদ্বোয়ারা'—স্বুবর্ণ মন্দির দর্শন করতে। সঙ্গে পাঞ্জাবী ভ. সিংও আছেন।

স্বুবর্ণ মন্দিরে এসে মা 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ শুনতে বসলেন। ছোট্ট মেয়েটির মত বসে মা পাঠ শুনছেন। সেও এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

এখানে এসেও মা'র ভাব হলো। মহাভাবে বিভোর হলেন। মা বলেন, 'সর্বধর্মই এক ধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।'

তারপর মা হেসে হেসে ভক্তদের বললেন, 'তোরা যে আমি সর্বদা ঘুরছি বলে বকিস, আমি ঘুরে তোদের কি ক্ষতিটা করলাম? দেখ্ তো, সপ্তমীতে বৈজনাথ দর্শন, অষ্টমীতে জ্বালামুখী, নবমীতে ফ্যাংড়া মন্দির, আর দশমীতে গুরুদ্বোয়ারা দর্শন করলি। একি কম সৌভাগ্যের কথা! সকলের ভাগ্যে কি এমনটি ঘটে! তবুও তোরা আমাকে বকিস।'

এবারে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও হাসতে লাগলেন। মা আনন্দময়ী আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত করে দিলেন ভক্ত-প্রাণে।

মা আবার বলছেন, 'সময় চলে যাচ্ছে। ভাল লাগুক আর না লাগুক, চেষ্টা করে যাও। তাঁকে লক্ষ্য করে চলো।'

তারপর অকস্মাৎ অমৃতসরের লীলা সাঙ্গ করে মা যাত্রা করলেন আলমোড়ার পথে।

মা বলেন, একই সব, সবই এক। সেই এক ব্যতিরেকে আর কোন অস্তিত্বই নেই।

ষোল

'দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে সত্যের অনুসন্ধান করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। সত্য ত্যাগ ব্রহ্মচর্য এবং সংযমাদির সহায়তায় শ্রীগুরুদত্ত বিষয়ের আশ্রয়ে থাকাই কেবল করণীয়।'

'শুধু বাক্‌সংযম করে থাকলেও ধীরে ধীরে শান্তভাবের অনুকূল হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে ইসারা করা বা লেখাও ঠিক না। আর দেখ এই ভাবের সংযম করলেও মিথ্যা কথা, কটু কথা, বাজে কথা ইত্যাদি বন্ধ থাকে। বেশী কথা বললেই শক্তি ক্ষয় হয়। তাই শুধু বাক্‌সংযমেও ভিতরে একটা শক্তি হয়। কিন্তু অন্তরে সর্বদা যথাশক্তি ধ্যান জপের চেষ্টা রাখা দরকার।'

'আনন্দময়ী মা কে? আনন্দময়ই বা কে? ঘটে পটে সর্ব হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। সর্বত্রই তাঁর বাস, হয় না কখনও তাঁর নাশ। তাঁকে দেখলে, তাঁকে পেলেই সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ আপনাকে জানলে আর ভয়ের কিছু থাকে না। নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় আবার কি? আমিই সমস্ত, আমিই সর্বাংশ। কেবল নির্ভর কেবল স্মরণ। এই শরীরটাকে সকলে ভগবান, ভগবান—মা, মা—এ সব বলবে। আবার বলবে কে? নিজেই ত বলে, নিজেই বলরে। এক ছাড়া দুই কই? অনন্ত প্রকাশ ত। আমি কি অন্য কারো কথা বলি? আপ্ত বচন প্রমাণ নিশ্চয়।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন, ভক্তদের সোলনে। ভাইজীর তিরোধান তিথি উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্ত শ্রীদুর্গা সিংহজী (যোগীভাই) মাকে নিয়ে এসেছেন। রাজাসাহেব ভাইজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাই এই উৎসব। এই আয়োজন। উদয়াস্ত নামকীর্তন, পূজা, পাঠ, আরতি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মাও ভক্তসনে বসে লীলা করছেন।

গৃহী ও ব্রহ্মচারী ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করছেন।

এদিকে পুরনো ভক্ত জিতেনবাবু খুব ছুটোছুটি করছেন। সিমলা থেকে এসেছেন। সেখানের কালীবাড়িতে নামযজ্ঞের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সিমলার ভক্তরা মায়ের উপস্থিতি আশা করছেন। মা কোন কথা দিচ্ছেন না। তাই ভক্ত জিতেনবাবু মনে শান্তি পাচ্ছেন না। আশঙ্কা ও সংশয় নিয়ে মায়ের কাছে কাছেই ঘোরাঘুরি করছেন। এই জিতেনবাবু হলেন শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারত সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী। উচ্চপদস্থ অফিসার। কিন্তু মায়ের নামে পাগল। আত্মহারা। মায়ের পুরাতন ভক্ত। ভক্তপ্রবর জিতেনবাবু নাছোড়-বান্দা। অবশেষে মা কৃপা করলেন, কথা দিলেন।

মা আনন্দময়ী এসে পেঁৗছুলেন সিমলায়। কালীবাড়িতে। সূর্যোদয় হতেই কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। সেই মহামহোৎসবে মাকে পেয়ে ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। দিকে দিকে প্রচারিত হলো মায়ের আগমন-সংবাদ। সিমলা আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো মাতৃ-আগমনে। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে করতে কীর্তন করতে লাগলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব। মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর ভাব। মা আনন্দময়ী যে মূর্তিমতী সাক্ষাৎ মহাভাব। তাইতো তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা কথা সংকীর্তনে বিভোর হয়ে লেন। তারপর ধীরে ধীরে সুমিষ্ট কণ্ঠে গান ধরলেন ঃ

দুর্লভ ভজন হেন,
নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম,
নাহি দেখ বেদ-ধর্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণ পদ দ্বন্দ্বে॥

কি সে ধ্বনি! কি সে কণ্ঠস্বর! মধুর ভাবময় সঙ্গীত। সঙ্গীত

নয় যেন সঙ্গীতরসধারা। যেন মধুর হৃদয়সুধা—ঢেলে দিয়ে ভক্তদের তাপিত-প্রাণে এনে দিচ্ছেন শান্তি। পরম শান্তি। পরমানন্দের আভাস। অনির্বচনীয় অভাবনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি করলেন মা আনন্দময়ী। সিমলার কালীবাড়িতে। পরিতৃপ্ত হলেন অমেয় সৌভাগ্যবান সিমলার ভক্তদল।

অধিক রাত্রিতে মা আবার ফিরে এলেন সোলনে। সোলনের ভক্তদল, রাজাসাহেবও মেতে উঠলেন নামগানে। কৃষ্ণকীর্তনে।

শ্রীশ্রীমা কৃষ্ণগুণগান করে ভক্তগণকে ব্রজরস-মাধুর্য পান করালেন।

এইভাবে সমস্ত রাত্রি অতিক্রান্ত হলো। প্রভাতকালে রাজাসাহেব ও ভক্তবৃন্দ ব্রহ্মানন্দময়ী মা আনন্দময়ীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে পরিতৃপ্ত হলেন।

অবশেষে মা আনন্দময়ী সোলনের লীলা সাঙ্গ করে হরিদ্বার হয়ে চলে এলেন দেরাদুনের রায়পুর-আশ্রমে।

* * *

'পিতাজী জেলেই ত আছে। তুমি বুঝি ভেবেছ মুক্ত হয়েছ? আসল মুক্তির জন্য—তাঁর জন্য একটু একটু সময় দিতে চেষ্টা কর। তাঁরই সেবা তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন—যদি এই ভাবটি রাখা যায় তবে আর বন্ধনের কারণ হয় না। তা না হলেই বন্ধনের কারণ হয়। প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভাব জেগে ওঠে। আবার মা'র সেবা কে করে? নিজের সেবা নিজেই করছে। আবার তাঁর সেবা তিনিই করছেন। সেবাও তিনি, সেবকও তিনি, সেব্যও তিনি। এক ভিন্ন দুই ত নাই।'

মা বলছেন দেশসেবক শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজকে। দেরাদুনে। রায়পুর আশ্রমে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছেন। জওহরলাল নেহরু তখন দেরাদুন জেলে ছিলেন। শেঠজী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে

এসেছেন। প্রথম দর্শন। অভিভূত হয়ে মা'কে দেখছেন আর মায়ের শ্রীমুখের কথা শুনছেন।

অবশেষে মা আনন্দময়ীকে সাক্ষাৎ দেবীরূপে নয়নগোচর করে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। গান্ধীজীর অনুগত যমুনালালজীও প্রথম দর্শনেই মায়ের ভক্ত হয়ে পড়লেন। মা তাঁর নাম রাখলেন 'ভাইয়া'। শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ আনন্দময়ীর ভক্তদলের মধ্যে 'ভাইয়া' নামে সুপরিচিত হলেন।

যমুনালাল বাজাজের সন্তান ভাব। বাৎসল্যরস। শিশুর মত সরল ভাবে বলছেন, 'মা, আমার বড় ভাল লাগছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না।'

তারপর সমস্ত দিনটিই আশ্রমে কাটালেন। পরবর্তীকালে যমুনা-লালজী বলেছিলেন, 'অনেক স্থান ঘুরেছি। অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ হয়েছে। কিন্তু মাতাজীর মত এমন জীবন্ত সাধুর দর্শন লাভ আর হয়নি।'

ভক্ত যমুনালাল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাতৃনামে বিভোর হয়ে ছিলেন; এবং পত্নী জানকীবাঈ ও পুত্র কমলনয়নও শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত হয়ে পড়েন।

মহাত্মা গান্ধীও পরবর্তীকালে মা আনন্দময়ীকে বলেছিলেন, 'যমুনা-লাল আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলেছে যে আমার নিকট হ'তে যে শান্তি সে পায়নি, আমি যে শান্তি তাকে দিতে পারিনি, সেই শান্তি সে তোমার নিকট হতে পেয়েছে।'

মাও ভক্তদের বলেছিলেন, 'সকলে ত এই শরীরের সব কথা ধরে কাজ করতে পারে না। কিন্তু যমুনালাল—তোমাদের 'ভাইয়া'— অনেকটা করেছিলো।

এই শরীরটার সঙ্গে সে এত অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে শিশুর মত মিশে ছিলো। এরকমটা সাধারণতঃ দেখা যায় না।'

মা বলেন, এ জগৎ একটি মৃদঙ্গের মত। এর বাদক একজন। সে

যে বোল্ বোলায়, সে বোল্ বলে। কীর্তনে কি দেখতে পাও না মৃদঙ্গের তালে তালে বহু লোক নাচে গায়, কিন্তু বাদ্য যন্ত্র বা বাদকের প্রতি কয়জনের লক্ষ্য থাকে? সংসারে যার আনন্দের কণা নিয়ে সকলে সুখে দিন কাটায় তাঁকে কেউ জানতেও চায় না! সকল বিষয়ের মূলরূপে যিনি বর্তমান, তাঁর অনুসন্ধান কর—ইহাই তপস্যা—ইহাই সাধনা।

সতেরো

১৩৪৮ সন।

৮ই ফাল্গুন। শুক্রবার।

মা আনন্দময়ী এসেছেন সেবাগ্রাম আশ্রমে। সমস্ত আশ্রম প্লাবিত হয়ে উঠলো মাতৃ-আগমনে। মহাত্মা গান্ধী 'আইয়ে, মাতাজী—আইয়ে' বলে সাদরে আহ্বান করলেন আনন্দময়ী মাকে। মাও পিতাজী পিতাজী বলতে বলতে মহাত্মা গান্ধীর ঘরে প্রবেশ করলেন। মহাত্মাজী সাদরে শ্রীশ্রীমায়ের মাথাটি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মাও ছোট্ট মেয়েটির মত মহাত্মাজীর বুকের মধ্যে হাতখানি রেখে বসে রইলেন। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ।

তারপর মহাত্মাজী প্রথম কথা বললেন, মাতাজী, আমাকে তোমার কথা প্রথম কে বলে জান? কমলা নেহরু। সেই আমাকে বিশেষ করে বলেছিলো আমি যেন তোমার সঙ্গে দেখা করি।

তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, কমলা এঁকে গুরুর মত মানতেন।

মাও হেসে হেসে বললেন,—পিতাজী, আমি কারো গুরুটুরু নই। আমি ত' ছোট বাচ্চি।

মহাত্মাজীও হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা! আচ্ছা!

তারপর মাকে অনুরোধ করে বললেন, দেখ, তুমি যেন যাবার কথা বলো না। অন্ততঃ দু'দিন আরও এখানে থাক। যমুনালালের বিষয় নিয়ে আরও দু'দিনের কাজ আছে। তুমি থাকলে জানকীবাঈ ও কমলনয়ন খুবই শান্তি পাবে।

মাও মৃদু হেসে মিষ্টি করে বললেন, 'পিতাজী, এই ছোট্ট মেয়েটার মাথাটা কিছু খারাপ। সব সময়ে সব কথা রাখতে পারে না। তার কি করবো পিতাজী? তোমার স্বভাবই ত মেয়েটা পেয়েছে?'

এই কথায় সকলেই হেসে উঠলেন। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠলো গান্ধীজীর আশ্রম গৃহ।

মহাত্মাজী প্রত্যুত্তরে বললেন, এরা যে সকলেই হাসবে। বলবে কোথা থেকে একজন পাগল মেয়ে এনেছে, তাকে বুঝিয়ে রাখতে পারলো না। আর চীন দেশের সেনাপতিকে কি ভাবে বুঝাবে? সকলেই আমাকে তখন উপহাস করবে।

হেসে হেসে মা বললেন, বেশ ত, আমার বাবাকে নিয়ে লোকে যদি একটু আনন্দ করে হাসে, হাসুক না। আর আমার বাবা ত এই সব কথা গ্রাহ্যই করেন না। বাবার এই সবে কিছুই আসে যায় না।

এবারে মহাত্মাজী হাসতে হাসতে বললেন,—আমি ত অনেকেরই বাবা। তুমিও আমাকে বাবা বলছ, ভালই। আমি ভুলে প্রথমে তোমাকে মাতাজী বলে ফেলেছি।

মহাত্মাজীর সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। এইভাবে গান্ধীজী মা আনন্দময়ীর সাথে সরল রসিকতায় মেতে উঠলেন।

গান্ধীজী আবার বলছেন, যমুনালাল জেলে বসে সূতা কেটে সেই সূতা দিয়ে এক জোড়া কাপড় বানিয়ে মাতাজীর জন্য রেখে গেছে। মাতাজী তার মধ্যে এক টুকরা আমাকে, এক টুকরা জানকীবাঈকে, এক টুকরা বিনোবাজীকে আর এক টুকরা নিজের জন্য রেখেছেন।

মাও মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, পিতাজী, আমিও একবার নিজের হাতে সূতা কেটে এক জোড়া কাপড় বানিয়েছিলাম। আমি চরকায় সূতা কাটতে জানি। আর আমি ত পিতাজীরই কাপড় পরি।

গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যেখানে যেখানে খদ্দর বানানো হয়, সব আমারই কাপড়।

এবারে ভক্ত কমলনয়ন বললেন, বাপুজী, মাতাজীকে আপনার কাছে রেখে যাই। তবে আর মাতাজী যেতে পারবেন না।

মহাত্মাজীও আগ্রহভরে বললেন, বেশ, জানকীবাঈ ও মাতাজী এখানেই থাকুন। শোবার বন্দোবস্ত করে দেবো।

ইতিমধ্যে কস্তুরীবাঈ এসে মা আনন্দময়ীকে প্রণাম করে বললেন, —খুব ভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা আপনাকে দর্শন করবার। আজ সার্থক হলো, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হলো।

এবারে গান্ধীজী শ্রীযুত হরিরাম যোশীকে লক্ষ্য করে বললেন,—যোশী, তুমি কি মা'র সঙ্গেই আছ?

হরিরামজী প্রত্যুত্তরে বললেন, মা আমাকে কাশী থেকে তার দিয়ে আনিয়েছেন।

এই কথা শুনে মহাত্মাজী মাকে বললেন,—আমার কাছে তোমার একা আসতে ভয় করে নাকি?

মাও হেসে হেসে জবাব দিলেন,—ভয়ের ত কথা নেই। ও বলেছিলো এদিকে এলে খবর দিতে। তাই খবর দিয়েছিলাম।

এবারে মহাত্মাজী মজা করে হাসতে হাসতে বললেন,—আচ্ছা, তুমি হুকুমও চালাও?

এইভাবে নানারকম কৌতুকের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রান্ত হলো। ভক্তবৃন্দ, মহাত্মাজীর সেবক-সেবিকারা, সেবাগ্রাম আশ্রমের বাসিন্দারা বাপুজী ও মা আনন্দময়ীর কথোপকথন শুনে বিমল আনন্দ উপভোগ করলেন মনে মনে। নীরস দার্শনিক আলোচনা বা গভীর তত্ত্বকথা

হলে তাঁরা এমন নির্মল পবিত্র আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হতেন না। এও মায়েরই ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হলো। মা আনন্দময়ী মহাত্মাজীকে দর্শন দিয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে রাত্রিবাস করে, ভোরের বেলা পথে বের হয়ে পড়লেন। সেবাগ্রাম আশ্রম—ওয়ার্ধা ত্যাগ করে—মা আবার সম্মুখের পথে অগ্রসর হলেন। চলার আর বিরাম নেই। পথের পর পথ পিছনে ফেলে মা এগিয়ে চলেছেন সম্মুখের দিকে। অসীমের সন্ধানে।

আঠারো

আবার এলো বসন্ত।

পরিপূর্ণ। শান্ত। মধুঋতু। বসন্তের সেই মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো নৈমিষারণ্যের পবিত্রভূমি। সাধনার লীলাক্ষেত্র। বহু সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্য মিশে আছে নৈমিষারণ্যের ধূলিতে। সুদূর অতীতে এই তপোভূমিতেই কুলপতি শৌনক সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। আর মহা মহা ঋষিরা একত্রিত হয়ে সৌতিমুখে শ্রবণ করে ছিলেন অমৃতময় মহাভারত কাহিনী আর পুরাণ কথা। হাজার হাজার বছর ধরে উপনিষৎ-রচয়িতা মহাকবিদের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করেছেন নৈমিষারণ্যের আশ্রমবাসীরা। এই নৈমিষারণ্যের ধূলিকণিকাও যুগ যুগ ধরে শত শত ভক্ত ও সাধকের হৃদয়ের অভ্যর্থনা লাভ করেছে। মহর্ষিদের চরণপূত ভারতের সেই পবিত্র তপোময় ভূমিতে আজ এলেন মা আনন্দময়ী। পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা।

জগজ্জননীর আগমনে প্লাবিত হয়ে উঠলো নৈমিষারণ্যের সত্যব্রত-ক্ষেত্র। শ্রীশ্রীমা এসে উঠলেন শিবের মন্দিরে। প্রাচীনের স্মৃতিকে বহন করে আজও এখানে জেগে রয়েছে শিবের মন্দির। শান্ত, কলরোল-

শূন্য শিবের মন্দিরে এসে মা দর্শন করলেন ভূতনাথকে। ভাবময়ী মা ভাবে বিভোর হয়ে জড়িয়ে ধরলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। ভোলা-নাথকে। শিব ঠাকুরকে। কি অপরূপ! কি সুন্দর, পবিত্র সে দৃশ্য। অবশেষে 'হর হর গঙ্গা' বলে শ্রীশ্রীমা শিবের মাথায় জল ঢালতে লাগলেন। অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলেন। মা বললেন, 'দেবতা স্পর্শ করে সেই হাত মাথায় দিলে গ্রন্থি খোলে।' মায়ের কথা শুনে ভক্তবৃন্দও শিবঠাকুরকে স্পর্শ করে সেই হাত মাথায় দিতে লাগলেন। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

অবশেষে ভক্ত অভয়, গুরুপ্রিয়া দেবী, কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী, পরমানন্দ স্বামী, মুক্তি বাবা, সাধন ব্রহ্মচারী ও আরও অন্যান্য ভক্ত-জনেরা মাকে ঘিরে বসে শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করতে লাগলেন।

মা বলছেন, যে যে-পথটি ধরে আছ, সেই পথেই শুদ্ধভাব-পরিপুষ্টি লাভের জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ কর। লক্ষ্য যখন প্রাণময় হতে থাকবে, যার যা অবশ্যক—'আপসে আপ্ হো যায়গা।' কর্মক্ষেত্রে লোক স্বাধীন গতির অভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। ধর্মক্ষেত্রেও সেইরূপ। স্ব স্ব চিন্তার প্রসার না পেলে সাধকের সাধন-চেষ্টা সঙ্কুচিত হয়ে যায় যে।

সীমার মধ্যে একটি ভাব নিয়ে চলতে চলতে যখন লক্ষ্য স্থির হয় তখন সীমার বন্ধন খুলে যায় এবং একই বহু, বহুই এক হয়ে দাঁড়ায়। অসীমে পৌঁছাবার শক্তিলাভের জন্য প্রথমে সীমাবদ্ধ হয়ে চলা উচিত। দেহাধ্যাস যতক্ষণ প্রবল, বিধিনিষেধের গণ্ডীতে নিজেকে ততক্ষণ বেঁধে রাখা দরকার। এর জন্য চাই ধৈর্য। চাই সহিষ্ণুতা। বিশ্বপ্রকৃতি নিজে অস্থিরা হলেও কখনো কারো চাঞ্চল্যে সহায়তা করেন না।

এবারে একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মা, সুকর্ম করে কু-কর্মের ফলভোগ নষ্ট করা যায় কি না?

মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে মা বললেন, দেখ, কতকগুলি কর্ম আছে যা দ্বারা পূর্বকর্মের ফল নষ্ট হয়। যেমন, একজন মূর্খ লোক। লেখাপড়া

জানে না। লেখাপড়া শিক্ষারূপ কর্মের দ্বারা তার মূর্খত্ব দূর হলো। আয়নার ময়লা ঘষলে পরিষ্কার হয়। আবার যখন তোমরা বল যে জীবন্মুক্ত হলেও প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতে হয়, তখন বলা যায়, হাঁ, উহাও ঠিক। আবার বলা হয়, তেমন জ্ঞান হলে কোন কর্মই থাকতে পারে না। তেমন উন্নত যে হয় সে কি আর পূর্বকর্মফলগুলি নষ্ট করতে পারে না? তার আর কোন কর্মফলই থাকে না। জ্ঞানাগ্নি যে এতটা জ্বালাতে পেরেছে সে কি আর সবটা জ্বালাতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে।

তাই তো বলি, 'মানুষের জগতের দিকেই বিপথ বিপদ। সেই বিপদ হতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় নিজেতে নিজে স্বয়ং প্রকাশ হওয়া।

নিত্য এই জীবনে সব সময়টুকু তাঁরই কর্মে লেগে থাকার কেবল চেষ্টা। তাঁর রসে রসময় হওয়ার জন্য চেষ্টা করা। এক ব্রহ্মমুখীর অনুকূল ক্রিয়া।'

এই ভাবে 'আনন্দময়ী মা' মহা মহা ঋষিদের বহু সাধুসন্তের চরণপূত সুপ্রাচীন নৈমিষারণ্যের পবিত্র ভূমিতে বসে, যেন বেদ-উপনিষৎ ও গীতার মর্মবাণী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন ভক্তসনে। সেই প্রাচীন মন্ত্রদ্রষ্টাদের মত আজ আবার নূতন করে উদাত্ত কণ্ঠে মা যেন ঘোষণা করছেন,—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সকাল গেল। দুপুর গেল। সন্ধ্যা হয়ে এলো নিবিড়। শ্রীশ্রীমা নৈমিষারণ্যের লীলা সম্পন্ন করে ফিরে এলেন সীতাপুরে। অবশেষে সীতাপুর থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে মা আবার যাত্রা করলেন আলমোড়ার পথে।

১০ই বৈশাখ (১৩৫৫ সন) শনিবার। অপরাহ্ন। শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ-সহ এসে পৌঁছুলেন আলমোড়ায়। এসে উঠলেন পাতাল-দেবীতে। ভাইজীর সমাধি মন্দিরে। স্থানটির গম্ভীর সৌন্দর্য

অবর্ণনীয়। বেলা হেলে পড়েছে। হলদে রোদ তখন পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অরণ্যে, পাহাড়ের চূড়ায়, দূর বনের মাথায়। অপরাহ্ণের সেই ঘনায়মান ছায়া ভাইজীর সমাধি মন্দিরকে যেন আরও গম্ভীর রহস্যময় সৌন্দর্যদান করলো। এমনই এক পরম বিচিত্র মুহূর্তে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এসে উপস্থিত হলেন ভাইজীর সমাধি মন্দিরে।

দিকে দিকে প্রচারিত হলো মায়ের আগমন সংবাদ। আলমোড়া আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো আনন্দময়ী মার আগমনে। দলে দলে ভক্তেরা ছুটে এলো করুণাময়ী জননীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো অধিক রাত্রি পর্যন্ত।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য জেগে উঠলো আলমোড়ার চতুর্দিকে। চঞ্চল হয়ে উঠলো নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের অন্তর। তিনিও স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন মাতৃ-সন্নিধানে। সপরিবারে। আলমোড়াতেই আছেন। এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নৃত্যশিল্পীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম দর্শন।

ভাবময়ী 'আনন্দময়ী মাকে দেখছেন জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর।

বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছেন।

রিক্তা, নিরাভরণা, দীনবেশা এক সন্ন্যাসিনীর মুখের প্রতি। কি অদ্ভুত এক আনন্দ ফুটে রয়েছে ঐ মুখের উপর। যেন কোটি সঙ্গীতের মধুরতার মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছেন। শান্তি ও আনন্দের প্রতিমূর্তি। বিরাট শান্তিতে মৌনী হয়ে রয়েছেন। মৌনী মা নন। আনন্দের আধার আনন্দময়ী মা। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

বিহ্বল হয়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন শিল্পী উদয়শঙ্কর, শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। জগজ্জননীকে। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। তারপর ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'মাগো, আমার

বড়ই ইচ্ছা করে ঐ চরণ স্পর্শ করতে। কিন্তু আপনি ত তা দেবেন মা। আমার হৃদয়েই রইলো ঐ চরণকমল দুটি।'

মা মৃদু হেসে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। নৃত্যশিল্পী উদয়-শঙ্কর ভক্ত উদয়শঙ্করে রূপান্তরিত হলেন। নব জীবন লাভ করলেন।

অবশেষে শুরু হলো কীর্তন। নাচের স্কুলের ছেলেমেয়েরা মিলিত কণ্ঠে মাকে শোনালো কীর্তন।

শ্রীশ্রীমা কীর্তন শেষে উদয়শঙ্কর ও অন্যান্য শিল্পীদের লক্ষ্য করে বললেন,—দেখ, পৃথিবীতে সবই নাচিতেছে। এই যে কথাবার্তা হচ্ছে এও নাচেরই একটা তরঙ্গ ছাড়া আর কি? দেখ কি তামাসা! এই শরীরটার ভিতর যখন সাধনার খেলাটা চলছিলো তখন তিনদিন আরতির ভাবে ঐ শরীরটা দিয়ে কত ক্রিয়াই যে বয়ে গেছে তা আর কি বলবো? ওগুলিকে তোমরা নাচই বল আর যাই বলো। কখনও দেহটা পড়ি পড়ি করেও পড়ে যায়নি। কখনও বা আঙুলের উপর ভর দিয়ে কখনও বা হাত পা ঘাড় মস্তক ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একভাবে ক্রিয়া করতো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের গতিও হয়ে যেতো পরিবর্তিত। একদিন ভোলানাথকে বলা হলো, 'তুমি বস। আমি আরতি করি।'

সে বসলে এমনভাবে আরতির ক্রিয়া শরীরে হতে লাগলো যা দেখে ভোলানাথ ত অবাক! সে বলে উঠলো, এসব কি হচ্ছে। তখন পর্যন্ত নৃত্যাদির কথা শুনাও হয়নি। দেখা ত দূরের কথা। দেখ সকলের ভিতরেই সব আছে। শুধু ফুটাইয়া তোলাই হলো আসল কথা।

আবার বলছেন, দেখ নাচটা কি? না, তরঙ্গ। যেমন বীজ বুনলে তার মধ্যে একটা স্পন্দন বা তরঙ্গ না থাকলে বীজ ফেটে গাছ হতে পারে না, যেমন জলাশয়ের জলে বাতাস না লাগলে ঢেউ হয় না, সেই রকম সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় সবতাতেই আছে তরঙ্গ। এই তরঙ্গই হলো নাচ। যেমন রান্না করতে গেলে, এই বাসনটা এই

রকমভাবে রাখলে, তারপর রান্না করতেও এইভাবে বসলে, হাতটা এইভাবে নাড়লে তবে রান্না হলো,—এই সবই নাচ। নৃত্যেরই তালে তালে সবকিছু। গতি এবং স্থিতি একসঙ্গেই আছে। যেমন জলাশয়। একটা জলাশয় একভাবেই আছে, এ হলো স্থিতি। আবার ঐ জলাশয়ে তরঙ্গ আছে এ হলো গতি। 'আবার দেখো নাচের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতারও সম্বন্ধ আছে। যদি ওই ভাবটা নিয়ে কাজ করা যায় তবে সহায়তা হবেই। এই নাচের তরঙ্গ তারপর নিস্তরঙ্গ ভাবে গিয়ে শেষে তরঙ্গ নিস্তরঙ্গের উপরে চলে যাওয়া। যা হতে এই সবই আসছে। সেই মূলে যাওয়া চাই কি বল?

নৃত্যশিল্পের অপরূপ ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন উদয়শঙ্কর, অমলাশঙ্কর, প্রভাত গাঙ্গুলী, ফরাসী মহিলা সিমকী, সতীদেবী ও অন্যান্য শিল্পীরা।

উদয়শঙ্কর সানন্দচিত্তে বলে উঠলেন, হ্যাঁ মা, এই ত নৃত্য। আপনি অতি সুন্দর কথা বলেছেন। তারপর শ্রীযুত প্রভাত গাঙ্গুলীকে লক্ষ্য করে বললেন,—দেখ, এতদিন যে আমরা এই বিদ্যার আলোচনা করে আসছি, আজ মা'র মুখে শুনলে ত তার সুন্দর ব্যাখ্যা। মা ত আর নৃত্যকলা-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। কিন্তু দেখ, কি আশ্চর্য! কি সুন্দর সঠিক ব্যাখ্যা করলেন। নৃত্যকলার এমন সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই। আমি মায়ের নিকট চিরঋণী হয়ে রইলুম। এইভাবে 'আনন্দময়ী মা' দিনের পর দিন ধ্যানমৌন হিমালয়ের কোলে অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বসে ভক্ত সনে লীলায় মত্ত হয়ে রইলেন।

১৯শে বৈশাখ। সোমবার। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিবস প্রতিপালিত হলো। মহাসমারোহে। আলমোড়ায় পাতালদেবীতে। ভক্ত উদয়-শঙ্কর ও তাঁর ছাত্রছাত্রীবৃন্দও অংশ গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এলেন তাঁদের সাধনার মন্দিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সাধনার ক্ষেত্র। অনুচ্চ শৈলমালায় ঘেরা। নির্জন স্থান।

প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও সভ্য-জগৎ হতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত পাহাড় আর বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁরা করে চলেছেন নৃত্যগীতের সাধনা। অপূর্ব তাঁদের সঙ্গীত। মনোমুগ্ধকর তাঁদের নৃত্য।

গুরু হলেন নটরাজ শিব। তাই উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠা করেছেন শিবের মন্দির। উদয়শঙ্কর বললেন, 'শিবের মূর্তিটি হঠাৎ এখানে পাওয়া গেল। তাই স্থাপন করলাম। শিব হলেন আমাদের গুরু।'

মাও মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বললেন,—স্থাপন করবার জন্যই তোমাকে নিয়ে এসেছেন।

শিবের মন্দির দর্শন করে 'মা' আনন্দিত হলেন। খুশী হয়ে শিল্পীদের আশীর্বাদ করলেন।

অবশেষে শুরু হলো নৃত্য গীত। ছাত্রছাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নৃত্য গীত করতে লাগলো শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে। এ যেন শিল্পীরা শিল্পের সাধনা করে চলেছেন—সিদ্ধিলাভের আশায়। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

এই পাহাড় আর পিয়ালবনের সুরে বাঁধা তাঁদের গান শুনে আর নৃত্যনাট্য রামলীলা দর্শন করে শ্রীশ্রীমা মুগ্ধ ও আনন্দিত হলেন। ভাবময়ী মায়ের মহাভাব হলো।

আবার শুরু হলো লীলা। ভক্ত ও ভগবানের লীলা। লীলাময়ী মা আনন্দময়ীর লীলা। হিমালয়ের পাদদেশে। হিমালয়! মহিমময় হিমালয়! দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা। বিচিত্র ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে পথ। দূর হতে রেখার মত যায় দেখা। অজস্র বন্যফুলে ভঁরা সে পথ। প্রকৃতি দেবী যেন ফুলের খই ছড়িয়ে রেখেছেন বৃক্ষতলে। শিলাখণ্ডে। আর ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে বন্যফুলের সুগন্ধ। মোহনীয় এক পরিবেশের হয়েছে সৃষ্টি।

এমনই এক অপূর্ব গম্ভীর সৌন্দর্যমাখা পরিবেশের মধ্যে নিস্তব্ধ

দুপুরে আনন্দময়ী মা বসে আছেন একখানি উপলখণ্ডের উপরে। আর ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে শুনছেন মায়ের শ্রীমুখের কথা। মা বলছেন,—দেখ, একান্ত না হলে শ্রীকান্তকে পাওয়া যায় না। নীরব ও নির্লিপ্ত ভাবে যারা পরমপুরুষের সাধনা করতে চায়, হিমালয় তাদের পক্ষে বড়ই অনুকূল স্থান। চারিদিকে প্রকৃতি গুরুগম্ভীর ও শান্তশীল। ইহার ক্রোড়ে বসে অনন্তের চিন্তা বা আত্মবিচার স্বভাবতঃই সহজ। ভাবকে লক্ষ্য করে যার সাধনা, সমুদ্রতীর তার উপযোগী। তরঙ্গে তরঙ্গে ভাবের হিল্লোল এসে ভাবময় সীমাতীত ভাবে তাকে ডুবিয়ে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবে। যার মন মাত্র সাধন পথের পথিক হবার জন্য হয়েছে উন্মুখ, কোন নিভৃত রমণীয় স্থান তার পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণ গৃহধর্মীর পক্ষে ঈশ্বর চিন্তার জন্য অন্ততঃ ঘরের কোণায় একটি নির্দিষ্ট শুদ্ধ স্থান করা আবশ্যক। যে ভগবৎ প্রেমে সর্বত্যাগী, যার চোখে ভগবান সর্বময় তার স্থান সর্বত্রই সুলভ। মনকে নিয়মিত করে সকল অবস্থার উপরে উঠবার চেষ্টা কবো, তাহলে স্থান অস্থানের দ্বন্দ্ব যাবে ঘুচে।

শরণাগত ভক্ত হতে হলে ভাষা ও ভাব থেকে 'আমি'র মূলোচ্ছেদ করে বুদ্ধি বিচারটা একেবারে ভেঙে দেওয়া আবশ্যক। শিশু হাগে মুতে আবার তাই গায়ে মাখে, তাতেই গড়ায়। অথচ অবিচারে আবার মায়ের কোলে আসতে হাত বাড়ায়। তাই অবুঝ বলে মা তাকে ধুয়ে মুছে সর্বদা হাসিমুখে কোলে তুলে নেন। ইহাই হলো নিঃস্বার্থ স্নেহ ও প্রেমের বিধান। এরূপ আত্মহারা একটা সাধনায় অন্য কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই। এমনি হবার চেষ্টা কর। তাহলে সহজে মায়ের কোলে যেতে পারবে। বুদ্ধির খেলা খেলবার চেষ্টা করো না। মনে রেখো অবা না হ'লে ভগাকে পাওয়া যায় না।

অকস্মাৎ শ্রীশ্রীমা মুক্তিবাবাকে উদ্দেশ করে ছেলেমানুষের মত খুব উৎসাহ ভরে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'এইসব স্থানে দেখি কি বাবা, এই মাটির মধ্য দিয়ে জটাজুটধারী সাধুরা উঠছেন আর উঠে উঠে চলে

যাচ্ছেন। একজন নয়। অনেকজন আবার একদিন দেখি অনেক সাধু এইখানে বসে আছেন। এই শরীরটাকে দর্শন দিতে এসেছেন।

ভক্তরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করছেন। ভক্ত অভয়। স্বামী পরমানন্দ। গুরুপ্রিয়া দেবী। সতী দেবী। মুক্তি বাবা। চিৎবাবা। হরিরাম। হংসভাই। শের সিংজী। রামসিংজী। গোবিন্দ পাণ্ডেজী। প্রভাত গাঙ্গুলী। প্রবুদ্ধানন্দজী। ফরাসী মেয়ে সিম্কী। পরিমলবাবু। অবনীবাবু। সত্যদেব ঠাকুরের শিষ্য রামবাবু। আরও অনেকে।

রামবাবু বলছেন, আচ্ছা মা, কাজ করতে বসলেই দেখতে পাই বাইরের দিকে কে যেন মনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি?

মা হাসি হাসি মুখে সহজ ভাবে বলে উঠলেন, 'তাও জান না বুঝি? বাসনার বীজ টেনে আনে। তবুও তাঁর দিকেই লেগে থাকতে হয়। যেমন দেখ না সমুদ্রের ধারে যখন নেমে স্নান করতে যাও সমুদ্র পারের দিকেই ঠেলে দেয়। আরও যদি ভিতরের দিকে যেতে থাকো তবে দেখবে সমুদ্র নিজের ভিতরের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এও তাই।'

আবার বলছেন, 'বাসনার বীজই আসা যাওয়ার মূল। Return Ticket কাটছো। আসা আর যাওয়া। একের মধ্যেই যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়। এক ছাড়া ত দুই নাই। আমরা যে এক ঘরেরই সব। এই বাসনার বীজ নষ্ট করতে হলে নামাশ্রয় করে থাকতে হয়।'

সুন্দর উপমাসহ সরল ব্যাখ্যায় রামবাবু ও অন্যান্য ভক্তরা আনন্দিত হলেন। অনির্বচনীয় এক আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চললো ভক্তবৃন্দের মনের মধ্য দিয়ে। শ্রীশ্রীমা যেখানেই অবস্থান করেন সেইখানেই সৃষ্টি হয় এক আনন্দ-সাগর। আনন্দের মহাসাগর। মা যে আমাদের আনন্দময়ী!

এইভাবে সমস্ত দুপুর অতিক্রান্ত হলো। বৈকালের রোদ রাঙা হয়ে এলো উত্তুঙ্গ শৈলচূড়ায়। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। মা

ভক্তবৃন্দসহ চলে এলেন সমাধি মন্দিরে পাতালদেবীর আশ্রমে। শুরু হলো নাম গান। কৃষ্ণকীর্তন।

কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে মহানন্দে নৃত্য করতে করতে ভক্তমণ্ডলী নাম গানে মেতে রইলেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। পাতালদেবীতে। ভাইজীর সমাধি মন্দিরে।

মা বলেন, নাম করতে করতে কীর্তনের ভাব আসে। আর কীর্তন করতে করতেও জপ ধ্যান ধারণা আসে। 'পূজা অর্চনাতে যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ে কর্মাদির বিধান আছে কীর্তনও সেরূপ ভাবে করা আবশ্যক। এক সুর এক তাল হলেই ভাল হয়। যাঁকে নিয়ে কীর্তন, তাঁকে স্মরণে রাখিস, নতুবা কেবল বাদ্যোৎসব হবে, নাম কীর্তন নয়।

উনিশ

'যেমন তোমাকে আমি দেখছি আমাকে তুমি দেখছো, এইরূপ তাঁকে পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়, একটুও পার্থক্য নেই। আরও বিশেষ ভাবে নিকটে পাওয়া যায়—যেমন (নিজের হাত দেখিয়ে) এই হাত রক্ত, মাংস এবং হাড়ের সঙ্গে মিলে আছে।'

শ্রীশ্রীমা বললেন ডাঃ পান্নালালকে। এলাহাবাদে। সত্যিই ভগবানকে দেখা যায় কি না ? এই প্রশ্নের উত্তরে মা দৃঢ়কণ্ঠে এই কথাগুলি বললেন।

আবার বলছেন, 'তাঁকে পেতে অনুভব করতেচেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। তোমরা 'ভগবানকে চাই চাই' করো। বাস্তবিকই কি তোমরা মনে প্রাণে তাঁকে চাও, ভেবে দেখ ত ? যদি যথার্থ চাও নিশ্চয় তাঁকে পেতে পারো। চাইবার লক্ষণ কি জানো ? যেমন নৌকাডুবি যাত্রী কুল চায়। পুত্রশোকাতুরা মাতা চায় সন্তানকে। সেভাবে তাঁকে যদি চাও, তবে দেখবে তিনি দিনরাত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। তোমরা

তাঁর কাছে সংসারের নানা বস্তু চাও, তাই তিনি তোমাদের ধনজন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দ্বারা ভুলিয়ে রাখেন। তাঁকে তাঁর জন্য চাও, নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাবে।'

ডাঃ পান্নালাল শ্রীশ্রীমায়ের পুরানো ভক্ত। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী-বিয়োগে কাতর হয়ে মনের সংশয় দূর করবার জন্য নানা ভাবে মাকে প্রশ্ন করছেন।

আবার নিজের মেয়েকে দেখিয়ে মাকে বলছেন,—এর ভগবানের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ এ বলে যে এর মা রোজ ৭/৮ ঘণ্টা পূজা সন্ধ্যা নিয়ে থাকতো কিন্তু তা সত্বেও এত ভুগে কষ্ট পেয়ে মারা গেল কেন?

প্রত্যুত্তরে মা বলছেন, 'তোমরা ত বুঝ না তিনি কিজন্য কি করেন। ধর একটি ছেলেকে যখন তার মা ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে চায়, তখন কি একদিন তার হাতটা ধুলো, একদিন পা ধুলো, একদিন মাথা ধুলো—এই ভাবে তাকে পরিষ্কার করে কি? মা একদিন ধরে জোর করে সব ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। ছেলে হয়তো চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু তবুও ছাড়ে না। ভাল করে পরিষ্কার করতে হলে কষ্ট দিয়ে, কাঁদিয়েও পরিষ্কার করে দেয়। তোমরা ত বুঝ না কত জন্মের কত সংস্কার জড়িত থাকে। তা যদি এক জীবনে বেশী কষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েও শেষ হয়ে যায় তা কি তাঁর দয়া নয়? (ডাঃ পান্নালালের মেয়েকে দেখিয়ে) ওর মা খুব ভাগ্যবতী ছিল। আর দেখ শুভকর্ম যে যা করে তা নষ্ট হয়ই না। কুয়া খুঁড়ছো, জল হয়তো দেখছো না কিন্তু জেনে রেখো জলের নিকটে ক্রমশঃই যাচ্ছো।'

ডাঃ পান্নালাল মায়ের প্রাণস্পর্শী উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মাকে প্রণাম করে বললেন, 'আমার মনের সংশয় দূর হয়েছে। প্রকৃতই আমি মনে শান্তি পাচ্ছি।'

মাও মৃদু হেসে ভক্তকে আশীর্বাদ করলেন।

উত্তর প্রদেশের চীফ্‌ এঞ্জিনীয়ার মহাবীর প্রসাদ, হঠাৎ মাকে প্রশ্ন করছেন,—'মা, ডুব দিতে পারি না কেন ?'

মাও সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,—'শিকল যে এক হাত দিয়ে ধরে আছো, ডুব দিবে কি করে ?'

ভক্তরা হেসে উঠলেন। প্রশ্নকর্তাও মনের মত উত্তরটি পেয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো এলাহাবাদে।

এলাহাবাদের কৃষ্ণকুঞ্জে দুর্গাপূজা। তাই মা এসেছেন। ভক্ত কানাইয়ালালের আহ্বানে আনন্দময়ী মা'র উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা, তাই ত বসে গেছে আনন্দের হাট।

কৃষ্ণকুঞ্জের হলঘরটি কৃষ্ণের ছোট বড় ছবি দিয়ে সাজানো। প্রতিদিন কীর্তন ও আরতি হয়। তাই দুর্গাপূজার দিনেও মা কৃষ্ণপূজা করালেন

অবশেষে মা এসে বসলেন প্রতিমার পাশে। ভক্ত দাসুবাবু শ্রীশ্রীমা'র পূজা আরম্ভ করলেন। মা নিমীলিত নেত্রে স্থির হয়ে বসে আছেন। এক শিলাময়ী দুর্গামূর্তির মত। এ যেন মহামায়া স্বয়ং তাঁর করুণা ও প্রসন্নতা নিয়ে ভক্তসমীপে এসে বসেছেন।

প্রতিমা ও মাতে কোন প্রভেদ নেই। যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মত সম্মিলিত হয়ে আছেন। অপরূপ সে মূর্তি। দেবী-মূর্তি। রিক্তা, নিরাভরণা কোন সন্ন্যাসিনীর মূর্তি নয়। রাজরাজেশ্বরী, লোহিতবরণা, ত্রিনেত্রা, দশভুজা দেবী দুর্গার মূর্তি।

এই অপরূপ মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তরা মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। পূজক নিজেও যেন কি এক উন্মাদনায় মায়ের পূজা করে চলেছেন। ভক্ত হরিরাম অভিভূত হয়ে চণ্ডীপাঠ করছেন। অনির্বচনীয় অভাবনীয় সে দৃশ্য।

নবমী পূজার দিনে মা এসেছেন সাধন-সমর আশ্রমে। সেখানে গোপাল ঠাকুর মহাশয় ভাবের আবেশে মাকেই পূজা করলেন।

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের এক শিষ্যা শ্রীযুক্তা যমুনা দেবী মাকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাবাশ্রু নির্গত হতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'মাগো, কত দিনের আশা তোমায় দেখবো। কত কথা বলবো ভেবে ছিলাম। কিন্তু এখন তোমায় পেয়ে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মাগো, চোখ বুঝলেই তোকে দেখি। চোখ বন্ধ থাকলেও তোর মধুর অপরূপ মূর্তি দেখতে পাই। মাগো, আজ আমার আনন্দ যে আর বুকে ধরছে না। আমি সহ্য করিতে পারছি না। এ কি আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ!' অভিভূত হলেন ভক্তিমতী যমুনা-দেবী।

মা তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁকে শান্ত করলেন।

এইভাবে সমস্ত এলাহাবাদ প্লাবিত হয়ে উঠলো আনন্দময়ী মা'র উপস্থিতিতে। আনন্দদায়িনী মা আনন্দময়ী আনন্দ বিতরণের জন্যই যেন ভেসে চলেছেন দেশ হতে দেশান্তরে।

অকস্মাৎ মা এলাহাবাদের লীলা সাঙ্গ করে চলে এলেন ভিরাউটিতে। হরিবাবার আহ্বানে। হরিবাবার আশ্রমে। হরিবাবা যোগী ও সিদ্ধপুরুষ। পাঞ্জাবই তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে তাঁর আশ্রম আছে। সম্প্রতি মায়ের সংস্পর্শে এসে মায়ের ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলা শিখছেন। সর্বদাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। স্বপ্নাবেশে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং এসে তাঁকে কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে গেছেন। আনন্দময়ী মাও তাঁকে বাবা-বাবা বলে ডাকেন।

অবশেষে ভক্তবৃন্দসহ মা এসে পৌঁছুলেন ধনারী স্টেশনে। এখান থেকে ভিরাউটি যেতে হবে। হরিবাবা হাতী নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে হাতীতে বসিয়ে হরিবাবা স্বয়ং ভক্তবৃন্দসহ কীর্তন করতে করতে মাকে নিয়ে চললেন আশ্রম অভিমুখে। দলে দলে গ্রামের লোক এসে কীর্তনে যোগ দিল। পবিত্র প্রাণস্পর্শী সে কীর্তনের সমারোহ।

আশ্রমটি একটি বড় মাঠের মধ্যে। দূরে দূরে কয়েকটি কুটির করা হয়েছে। আশ্রমে চৈতন্য মহাপ্রভুর বড়্ভুজ মূর্তির ছবি আসনে বসান হয়েছে।

মায়ের কুটিরটি একটি নিম গাছের নিচে। গাছটির গোড়া ইট দিয়ে বাঁধানো। হরিবাবা ও উড়িয়াবাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কুটির। এ ছাড়া তাঁবুও ফেলা হয়েছে। উদয়াস্ত নাম চলছে। কৃষ্ণকীর্তন। মাকে নিয়ে সে যেন এক মহামহোৎসবের সমারোহ। মায়ের আগমন উপলক্ষ্যে বহু মানুষের মেলায় মুখব হয়ে উঠলো হরিবাবাব আশ্রম। ভিরাউটি গ্রাম।

সুহাস্যমণ্ডিতা মা আনন্দময়ী আশ্রমে এসে বসলেন মখমলের বিছানায়।

মাতৃ-উৎসব জেগেছে কীর্তনেব সুমধুব ধ্বনিতে, ধূপের সৌরভে আর পুষ্পসজ্জার সমারোহে। ভক্তিমতী স্ত্রীলোকেবা এসে মাকে আবতি করলেন। মাল্যে চন্দনে ও তিলকে আরও অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করলেন মা আনন্দময়ী। এইভাবে মাকে ঘিরে পূজা, আরতি, নামগান, নিমাইলীলা, রাসলীলা চললো কয়েকদিন ধরে।

অবশেষে আনন্দময়ী মা হরিবাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে লাগলেন। কোথাও পদব্রজে, কোথাও গরুর গাড়িতে আবাব কোথাও হাতীতে চড়ে। এ যেন স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। 'তোদের হাতে ধরি, পায়ে ধরি, একবার বল্ রে—এমন মধুমাখা হরিনাম একবার বল্ রে। বিনামূল্যে হরিনাম একবার বল্ রে॥'

পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো কৃষ্ণনাম, গৌরাঙ্গ নাম আর মা আনন্দময়ীর নাম। ভক্তিমতী পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা আনন্দময়ী মাকে শ্রদ্ধাভরে আদর করে বলে, বাঙ্গালী মাতাজী. আনন্দমাই, দুর্গামাই। মা যে আমাদের জগজ্জননী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

ভক্তবৃন্দ-পরিবৃতা হয়ে মা বলছেন, 'জগতে সকলেই এক পরম পিতারই সৃষ্ট বলে কারো সঙ্গে কেউ ভিন্ন নয়। যে রকম এক পরিবারে বহু ছেলে-পিলে হলে জীবনযাত্রা নির্বাহের সুবিধার জন্য দশ রকম ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে দশ জায়গায় দশখানি বাড়ি করে তারা বসবাস করে, তেমনি মূলে সকলে এক হলেও কর্মশৃঙ্খলার বশবর্তী হয়ে বহু ভাবে বহু রূপে দলবদ্ধ হয়ে সবাই রয়েছে মাত্র। জগতে যেমন রোগের প্রতিকারের জন্য অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে, যার যেটি উপযোগী সে সেই চিকিৎসা গ্রহণ করে—তেমনি ভবরোগীর জন্য শাস্ত্রবাক্যে ও সাধুমুখে নানা বিধান নানা উপদেশ রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত বা বৈষ্ণবের বিভিন্ন পথগুলি তাঁর দুয়ারেই পৌঁছেছে। রেল স্টেশনে ঢোকবার পথেই যত গোলমাল, যত ঠেলাঠেলি, প্লাটফরমে গেলে যার যার গন্তব্যস্থান নির্দিষ্ট!'

('জগতে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষার বস্তু কিছুই নেই। তিনি অনন্তভাবে অনন্তরূপে অনন্তলীলার খেলা খেলছেন। বহু না হলে এ খেলা কি করে চলে? দেখো না আলো ও আঁধার, সুখ ও দুঃখ, আগুন ও জল, কেমন করে একই শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে। মনে রাখবে শুদ্ধ ভাবের সঙ্গই সাধনা। আমরা যতই অশুভ বা সঙ্কীর্ণ চিন্তার প্রশ্রয় দিই, ততই আমরা জগতের অমঙ্গলের কারণ সৃষ্টি করি। পরের কি আছে না আছে তোমার বিচারের দরকার কি? নিজে তৈরী হও। নিজে সুন্দর হয়ে সুন্দর হৃদয়-আসনে চিরসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সবই সুন্দর দেখতে পাবে।)

ভগবান যে প্রেমময়। প্রেমের ঠাকুর। তাঁর কাছে যেতে হবে। খুব কাছে। তাঁকে ভালবাসতে পারলেই সব ভালবাসার সফলতা।'

কুড়ি

'তুমি সর্বত্র গুরুকে অনুভব করতে চেষ্টা কর। গুরু এতটুকু জিনিস? মনে কর এই আকাশ বাতাস গুরু। যে দিকে যা দেখি সবই আমার গুরু। এই যে কাপড় পরেছি, জামা পরেছি এও আমার গুরু। এইভাবে গুরু আমাকে জড়িয়ে আছেন। আমার হাড় মাংস ইত্যাদি সব গুরু ছাড়া কিছুই নাই। আমার প্রাণবায়ুরূপে গুরু আছেন। এই ভাবে তাঁকে সর্বাবস্থায় সবটার ভিতর পেতে চেষ্টা কর। নতুবা শান্তি নাই।

শ্রীশ্রীমা বলছেন লেডি ডাক্তার প্রেমকুমারীকে। প্রেমকুমারী মায়ের পুরানো ভক্ত লেডি ডাক্তার সারদা শর্মার সহোদরা। সম্প্রতি এঁর গুরু দেহত্যাগ করেছেন। শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে মায়ের কাছে এসেছেন শান্তিলাভের আশায়। মা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

আবার বলছেন, গুরুর আবাব মৃত্যু আছে নাকি? গুরু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু ব্যাপিয়া আছেন। এই অর্থে তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আবার বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে জগতে এক সৎ বস্তু আছে। তিনিই গুরু আবার তিনিই শিষ্য। গুরু শিষ্যে কোনও ভেদ নেই। এই অর্থে গুরু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাছাড়া গুরু মন্ত্ররূপেও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরু সর্বদাই শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রাণস্পর্শী কথামৃত পান করে শান্ত হলেন ভক্ত প্রেমকুমারী। মুগ্ধ হলেন ভক্তবৃন্দ।

মা এখন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে। ভক্তরা প্রতিদিন মাকে ঘিরে বসে মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে তৃপ্ত হচ্ছেন। মাকে পেয়ে বৃদ্ধ স্বামীজী ত গুহায় বসে তপস্যা করাই ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,—

শুধু একটানা জল-কলরোলের শব্দ। আর মাঝে মাঝে শোনা যায় মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতনিস্যন্দী সুরের কথামৃত। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো ভক্তরা। অবশেষে সেই রাত্রিরও হলো অবসান। ঊষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো গঙ্গাতীরের মন্দিরাদি। বৃক্ষরাজি। সমগ্র বারাণসী ধাম। ভোরের বাতাস বয়ে নিয়ে এলো মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। আর স্নানার্থী ভক্ত সাধুদের মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দোবদ্ধ সুমধুর স্বর। ধীরে ধীরে উদিত হলেন সূর্যদেব। প্রভাত কিরণে চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; প্রকৃতি দেবী যেন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মুখে হলেন বিরাজিত। মা আমন্দময়ীও অপরূপ অনির্বচনীয় এক মূর্তি ধারণ করলেন।

শুরু হলো নামগান। কীর্তন। ভক্তবৃন্দরা কীর্তন করতে করতে শ্রীশ্রীমাকে নৌকা হতে নীচে অবতরণ করালেন। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভাবানন্দময়ী আনন্দময়ী মা আশ্রম প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট জমিতে প্রথম পদার্পণ করলেন। ২রা ফাল্গুন মঙ্গলবার (১৩৫০ সন)। তাবপর শ্রীশ্রীমাকে ঘিরে কীর্তন হতে লাগলো। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তরা কীর্তন করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম হলো। ভক্ত ও সাধুদের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠলো ভবিষ্যতের আনন্দময়ী আশ্রম। কাশীর এই আশ্রমের জমির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে মা পরবর্তী কালে বলেছিলেন—'কাশীর ঐ জমিতে দেখছিলাম—যেমন তোরা বলিস না, মা এদিকে এস,—তেমনই কয়েকটি সাধু এই শরীরকে ডাকছিল। তাদের গায়ের রং সাদা। কাপড়চোপড়ও সবই সাদা। শরীর যেন মাখনের মত নরম আর একটা উজ্জ্বল ভাব। তারা এই শরীরটাকে নিজেদের কাছে নেবার জন্য খুব আগ্রহ করছিলো। দশজন সাধু। আর একদিন দেখি তারা খুব আনন্দ করছে। তখন নিজে নিজেই যেন বলছিলাম যে তোরা জায়গাটা করেই ছাড়লি। আর একদিন দেখেছিলাম খুকুনি ত জমির জন্য খুবই চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না যেন। তাই বিষণ্ণভাবে

বসে আছে। তখন আমি হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে মুক্তিবাবাকে বললাম—খুকুনিকে এইভাবে দেখছি। মুক্তিবাবা বললেন—তবে কি জমিটা হবে না? আমি বললাম—হওয়া না হওয়ার কথা বলছি না, এটা তো সাময়িকও হতে পারে।

আরও একদিন দেখছি, সাধুরা আমাকে ঘিরে নাচছে। এই শরীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। আরও দেখছি এখান হতে ওখান হতে নানা রকম সাধুরা কেহ উলঙ্গ কেহ নেংটিপরা সব যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে। তারপর শুনলাম এই স্থানটি সমাধিভূমি ছিল।'

এইভাবে সকাল গেলো, দুপুর গেলো, বৈকাল হয়ে এলো। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার নিজে এসে মাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন নিজ আলয়ে। সেখানে প্রাসাদের অভ্যন্তরে মন্দিরাদি দর্শন করে আর রাজপরিবারের সকলের ভক্তিভাব লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীমা খুবই আনন্দিত হলেন। সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা আবার ফিরে এলেন ভক্ত ননীবাবুর গৃহে। সেখানে রাত্রিতে পালা কীর্তন হলো। সমস্ত রাত্রি ধরেই চললো কীর্তন। বাতাস বয়ে নিয়ে চললো দূর দূরান্তে কীর্তনের সুমধুর সুর।

অবশেষে ভোর রাত্রে মা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এইভাবে মা আনন্দময়ী দিনের পর দিন কাশীতে ভক্তসনে লীলা করে আবার হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন উত্তরাখণ্ডের পথে।

একুশ

'মৌন ত হই নাই।

মৌন হলো মন বাত তাঁর দিকে রাখা। মনের কোন প্রশ্নই এখানে নাই। আর যদি বল, মৌন, তবে যখন কথা বলা হয় তখনও এ শরীরের মৌনই চলিতেছে। কারণ এক ছাড়া ত দুই নাই। সব

সময় একই ভাব। কাজেই মৌন করা হয় নাই। যাহা হইবার তাহা আপনা আপনিই হইতেছে—কখনও কথা বন্ধ কখনও কথা চলিতেছে।'

শ্রীশ্রীমা বলছেন গুজরাটী ভক্তদের। আমেদাবাদে। হঠাৎ মৌন অবস্থায়ই চলে এসেছেন। ভক্ত *কান্তি ভাই* ও *ভক্তিমতী* কুন্দন বেন-এর আহ্বানে। মা কেন মৌন হয়েছেন? *এই প্রশ্ন করায়* মা প্রত্যুত্তরে এই কথা বললেন।

শত শত দর্শনার্থীর ভিড়। মাকে শুধুমাত্র দর্শন করেই ভক্তরা মুগ্ধ। মায়ের আগমনে আবাব প্লাবিত হয়ে উঠেছে আমেদাবাদ শহব।

মা ভাঙা ভাঙা গুজরাটী ভাষা বলছেন। 'কেম ছে?' (অর্থাৎ কেমন আছ?) 'সারু ছে' (অর্থাৎ ভাল আছি), আর শিশুর মত সরল হাসি হাসছেন। প্রথম কথা শিখলে শিশুরা যেমন আধো আধো বলে, মায়ের মুখনিঃসৃত কথাগুলিও তেমনি মিষ্ট শোনাচ্ছে। গুজবাটী কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ ও ভক্তিমতী স্ত্রীলোকেরা মহানন্দে মায়ের কথা শুনছেন আর অপার অনির্বচনীয় এক আনন্দ অনুভব করছেন মনে মনে। সকলেরই যেন প্রাণ কেড়ে নিয়েছেন।

ল' কলেজের ছাত্ররা এসেছে। মাকে দর্শন করছে। কথায় কথায় মা বললেন, 'একটু সময় ভগবানের জন্য দিও। এই ভিক্ষা। বুকের জোর থাকলে অন্যের উপহাস সত্ত্বেও নিজের সৎকাজ ছাড়তে নেই। ইহাতে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ। নতুবা গোপনে নিজ কাজ করে যেও

নিন্দাকে কখনও গায় মেখো না। নিন্দাটা গোবরের মত। গোবর এমনি পড়ে থাকে তবে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই গোবরই যদি মাটির সঙ্গে মিশে সার হয় তবে তা গাছের গোড়ায় দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল এবং শস্য হয়। এইরূপ নিন্দাটা সহন করে নিতে পারলে ফল ভালই হয়। জমি উর্বরা হয় আর

কি। তবেই দেখ নিন্দাটাও কত ভাল জিনিস। নিন্দাটাও সেই একই-ত।

মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হলেন।

আমেদাবাদ থেকে মা হঠাৎ চলে এলেন দ্বারকায়। মা কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। দ্বারকায় এসে দর্শন করলেন দ্বারকানাথকে। পাণ্ডাদের অনুরোধে শ্রীশ্রীমা দ্বারকানাথের মস্তক হতে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই শ্রীশ্রীমা ধ্যানমৌন হয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে সেই স্থানেই কিছু সময় বসে রইলেন। অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ মায়ের সেই অনির্বচনীয় মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন।

অবশেষে মা এলেন গোপীতালাও দর্শন করতে। দ্বারকা থেকে তেরো মাইল দূরে। গোপিনীদের লীলাস্থল। তাই গোপীতালাও। এই স্থানের মাটি দিয়েই গোপীচন্দন তৈরী হয়। গোপিনীরা এখানে স্নান করেছিলেন। মা এই স্থান হতে মাটি তুলে ভক্তদের কপালে দিলেন। কত ভাবেই না মা আনন্দময়ী ভক্তসনে লীলা করে চলেছেন। মধ্যাহ্নে মায়ের ভোগ হলো। ফলাহার। ভক্তরাও প্রসাদ পেলেন।

এইভাবে সমস্ত দিন অতিক্রান্ত হলো। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। মা ফিরে এলেন ধর্মশালায়। নাম-গান। কৃষ্ণ গুণগান হলো অধিক রাত্রি পর্যন্ত। একজন পাণ্ডার স্ত্রী এসেও মাকে ভজন শোনালেন, মধুর কণ্ঠে। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে মা ভাবস্থ হলেন।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে এলো। তিমিরঘন রাত্রি। নীরব নিস্তব্ধ চতুর্দিক। শ্রীশ্রীমা যোগিনীর মত ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। অবশেষে সেই রাত্রিরও হলো অবসান। দিবালোক স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। দলে দলে ভক্তরা এসে উপস্থিত হলো আনন্দময়ী মাকে দর্শন করবার মানসে। অসংখ্য ভক্তের আগমনে মুখর হয়ে উঠলো ধর্মশালার গৃহ। প্রাঙ্গণ।

মা কিছুই বললেন না। শুধু দেবদুর্লভ হাসি হাসলেন

ইতিমধ্যে মাকে শোনানো হলো সারদা মঠের মোহন্ত স্বামী শঙ্করাচার্যের দেহত্যাগের সংবাদ। মা সংবাদ শুনে মৃদু মৃদু হাসলেন। গতকালই মা অলৌকিকভাবে তাঁকে দর্শন দিয়ে এসেছেন।

একজন পাণ্ডা বললেন, গতকাল সন্ধ্যায় আমার ঐ স্বামীজীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'এক মাতাজী এসেছেন। তিনি মহাযোগিনী। তোমরা গিয়ে তাঁকে দর্শন করো। তাঁর দর্শন দুর্লভ।'

একথা শুনেও মা কিছুই বললেন না। শুধু দেবদুর্লভ হাসি হাসলেন।

অবশেষে মা মঠে এসে শঙ্করাচার্যের মৃতদেহ দর্শন ও স্পর্শ করলেন। তারপর স্বামীজীর সমাধি কার্য শেষ হলে গোমতী নদীতে হাত মুখ ধুয়ে ভক্তবৃন্দসহ ধর্মশালায় ফিরে এলেন। শুরু হলো কীর্তন। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তরা কীর্তন করতে লাগলো। কীর্তনে মায়ের ভাবসমাধি হলো। ভাবস্থ অবস্থায়ই মা ভক্তদের বললেন, 'যতদিন বাহির সরাতে না পারো, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিকেও লক্ষ্য রাখো। আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করো। নিত্যানন্দের ধ্যান করো। শুভ মুহূর্ত উদয় হলে দেখবে ক্রমে সকল ধ্যান একমুখী হয়ে বাহির ভিতর এক করে দিয়েছে।'

'তন্ মন ধন দ্বারা তাঁর সেবায় লাগিয়া যাও। নতুবা ধর্মের সংসার কর। সকলের জন্য এক পথ নয়। শুধু ঘুরিয়া বেড়াইয়া অমূল্য সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাতে খারাপ হইবারই সম্ভাবনা। কারো পক্ষে সংসারের ভিতর দিয়া যাওয়াই মঙ্গলজনক।'

বাইশ

নেই বললে কিছুই নেই। আর আছে বললে সবই আছে। দেখো না, কেউ বলছে জগৎ মিথ্যে আবার কেউ বলছে সত্যি। অনেকে বলে, দেবদেবীর কোন সত্তা নেই। আবার কেউ বলে, নিশ্চয়ই আছে। এমন কি ডাকাডাকিতে এঁদের দর্শন লাভও হয়। এঁদের কথাও কানে শোনা যায়। শিশুর কাছে মাটি বা রবারের পুতুল জীবন্ত মানুষের মত সত্যি। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার সে দৃঢ় ধারণা অসত্যে পরিণত হয়ে যায়। কাজেই দেখা যায় প্রত্যেকের সাময়িক ভাবের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী বিষয়ের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিরূপিত হয়। প্রকৃত ভাব যখন একমুখী হয়ে জমতে জমতে ঘনীভূত হয়, তখন কারো কারো চিত্তে সংস্কার বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মহৎ ভাব প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং বাণীরূপে প্রকাশ পায়। একনিষ্ঠ ভাবুকের চিত্তগৃহে এসব নৈমিত্তিক উৎসব মাত্র। অধ্যাত্মপথে চলতে চলতে ঈশ্বর চিন্তার প্রবাহ ধরে যখনই আপনাকে হারানো যায়, তখনই এইরূপ বিবিধ খণ্ডবিভূতির স্বতঃসিদ্ধ দর্শনলাভ ঘটে। এরা অসহায়সূচক হলেও কদাচ সাধকের শেষ লক্ষ্য নয়। জল থেকে বাষ্পাকারে মেঘ জন্মে। কিন্তু এ মেঘের কোন সার্থকতা নেই, যে পর্যন্ত না বর্ষিত হয়ে জগৎকে তৃপ্ত করে। তদ্রূপ মহাসত্তায় ডুবে পূর্ণস্থিতি লাভ না করা অবধি সাধনার পূর্ণাহুতি হয় না।

সারনাথে বুদ্ধমন্দিরের সম্মুখে বসে শ্রীশ্রীমা বলছেন ভক্ত-মণ্ডলীকে।

গোবিন্দ মালব্যজী, হরিরাম যোশী, মহেন্দ্র সরকার, গুরুপ্রিয়া দেবী, স্বামী পরমানন্দ, মুক্তিবাবা ও অন্যান্য ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করছেন।

কাশীর নূতন প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে মা এসেছেন। সারনাথে যাওয়া আসা করছেন।

বুদ্ধমন্দিরের সম্মুখে এসে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে মা ভক্তদের অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী শোনাচ্ছেন।

আবার আধো আধো ভাষায় বলতে লাগলেন,—কেউ কেউ যেমন এই শরীরটার কথা বললে খুশী হয়, তেমন আবার এমন অনেকে আছে যারা এই শরীরটা চুপ থাকলে খুশী হয়। তাদের ভাবেই এই শরীরটা উপস্থিত চুপ হয়ে গিয়েছিল।

এখন আবার কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। কি করবো। বলা যে হুড়হুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কি করবো, বল ত? তোরা বলবি control নাই। আছে, নাইও। ঐখানেই যে। ঐ ঐ ঐ।

আবার বলছেন,—সাধনার খেলাটা যখন এই শরীরে হয়েছিল, কত রকম অবস্থাই ত এই শরীরে প্রকাশ হয়েছে। যেমন সাধকদের হয়। কারণ তখন ত সাধক সাজা হয়েছিলো। শোন্ ভক্তিভাবের কি সুন্দর প্রকাশ। কে একজন বললো 'সোঽহং স্বামীর এই রকম কথা।' এখন এই শরীরটার ভক্তিতে গদগদ হয়ে চোখের জল পড়তে লাগলো। শরীরটা বললো, 'আঃ, এই রকম কথা? কি সাংঘাতিক কথা!' 'আমিই সেই ভগবান,—এই কথা মুখ দিয়ে বের হবার চেয়ে যেন মরে যাওয়াও ভাল।' ঐ ভাবেই শরীরটা যেন কি রকম হয়ে গেলো। কি সুন্দর এক একটি দিকের প্রকাশ। শোনামাত্র শরীরটা অন্য রকম হয়ে গেল। আবার যে সময় 'আমিই সেই' এইরূপ সোঽহং ভাবটা এসেছিলো তখন আবার পূর্ণাঙ্গীন সেই স্বরূপেই প্রকাশ। কি সুন্দর! চমৎকার! দুইটি দিকেরই প্রকাশ। সবেতেই সব। আবার তাঁর স্বরূপ এক। সেইখানে আর কিছু দাঁড়ায় না।

এই কথাগুলি বলে অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে আপন ভাবেতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে নেমে এলো অপরাহ্ণ। অদূরাগত সূর্যাস্তের ম্লান আলোর ক্ষীণ আভা এসে মন্দির গাত্রে নৃত্য করতে শুরু করে দিলো। সেই সময়ে বুদ্ধমন্দিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতীব মনোরম। অবর্ণনায়। সেই অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে মা আনন্দময়ী আবার বলছেন, 'সূর্য চন্দ্র বা বাইরের আলো দিয়ে আর কয়দিন চালাতে পারবি? চোখ যখন দেখবে না, শরীর যখন চলবে না, বুদ্ধি যখন হবে বিভ্রান্ত, তখন যে কেবল অন্ধকারেই হাতড়াবি। সময় থাকতে থাকতে ভিতরের আলো জ্বালাবার চেষ্টা কর্। মনের চুল্লিতে আত্মবিচার বা নামের আগুন ধরিয়ে দে। সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা উপাসনাদির বাতাস দিয়ে সে আগুন সতেজ রাখ্। ক্রমশঃ এর জ্যোতি স্থির হয়ে যাবে। তখন সে আলোতে ভিতর বাহির আলোকিত হয়ে আত্মদর্শনের পথ সুগম করে তুলবে।

যদিও তিনি ভিতরে বাইরে সর্বত্র রয়েছেন, তবুও ভাবে ও কর্মে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখা দরকার। কেন না জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারগুলি এমন ভাবে মানুষকে বদ্ধ করে রেখেছে যে তাঁর সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। আগুনের তাপে যেমন ভিজে কাঠও শুকিয়ে আগুনের স্বরূপ ধারণ ক'রে আগুনের ইন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ভগবৎ স্মৃতির তীব্রতায় বিষয়বৃত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকলে হৃদয়ে ক্রমশঃ চিদানন্দের আভাস দেখা দেয়। কথাটা হচ্ছে এই, ধনজন প্রতিষ্ঠার উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতিও অন্তরে একটু রাখতে চেষ্টা করিস। সংসারটাকে ভেঙে আমি কাউকে বনে জঙ্গলে যেতে বলি না। তোরা সকলে ধর্মের সংসার কর্। এই আমি তোদের কাছে চাই। অর্থবিত্তশূন্য কোষাগারের যেমন কোন মাহাত্ম্য নেই, তদ্রূপ ধর্মহীন মনুষ্যজীবনের কোনও মূল্য নেই।

যা হবার তা হবে—সম্পূর্ণ সত্য কথা। নিজের জীবন ও পরের জীবনের ইতিহাস উল্‌টিয়ে দেখলে দেখতে পাবে যে মানুষ নিজেই বা

কতটুকু করতে পারে এবং অলক্ষ্য শক্তির অদৃশ্য বিধানেই বা কতখানি সংঘটিত হয়! জগৎটা সেই পরম পিতার ইচ্ছায় সুচারুরূপে নিয়মিত এবং তিনি যে অবস্থায় আমাকে রাখবেন বা আনবেন তাই আমি বরণ করবো—এ সিদ্ধান্তে যতই স্থির হতে পারবে ততই নির্ভরেব ভাব দৃঢ় হবে এবং ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসে প্রেমচক্ষু হবে উন্মীলিত।'

অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো। নিঃশব্দে নেমে এলো রাত্রি। সামনের বুদ্ধমন্দির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলো। মা ভক্তবৃন্দসহ চলে এলেন বিড়লার ধর্মশালায়।

এইভাবে সারনাথের মহান তীর্থভূমিতে লীলাময়ী মা ভক্তসনে লীলা করে চললেন দিনের পর দিন।

তেইশ

পুণ্যসলিলা উত্তর বাহিনী কাশীর গঙ্গা তীরে নবপ্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী আশ্রমে বাসন্তী পূজা।

৫ই বৈশাখ। ১৩৫: সন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সারনাথ থেকে এসেছেন। দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন ভক্তেরা। ভক্তসমাগমে আর স্বয়ং মায়ের উপস্থিতিতে শুরু হলো বাসন্তী পূজা। ধূপে দীপে ও গন্ধপুষ্পে পূজিত হলেন মৃত্তিকাময়ী বাসন্তীদেবী। মূর্তির পার্শ্বে যোগিনীর বেশে অধিষ্ঠিত রয়েছেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। অভাবনীয় অনির্বচনীয় সে দৃশ্য মৃত্তিকা মূর্তি নয় যেন জীবন্ত এক দেবী মূর্তি পূজিতা হচ্ছেন শ্রীশ্রীমায়েরই উপস্থিতিতে জ্যোতির্লেখার মত বিচিত্র এক প্রভায় দীপ্ত হয়ে উঠলো দেবীমূর্তি। যেন কোটি সূর্য সমুজ্জ্বল এক জ্যোতির্ময়ী আভা ফুটে উঠেছে মৃত্তিকাময়ী বাসন্তী দেবীর অন্তরাল হতে।

অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তেরা সেই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

দিকে দিকে প্রচারিত হলো আনন্দময়ী আশ্রমের নাম। গঙ্গার তরঙ্গধ্বনির মতই ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো সে নাম।

কাশীর আরও একটি বিস্ময়ের নিদর্শন হলো আনন্দময়ী ঘাট। পূজা মন্ত্র ও স্তব পুষ্প ও প্রদীপ আর স্নানস্নিগ্ধ জীবনের কলরবে মুখরিত সে ঘাট। সেখানে শত শত পুণ্যকাম স্নানার্থীর কোলাহল জাগে প্রতিদিন। হর-পার্বতীর লীলাভূমি পুরাণ কাব্য ও ইতিহাসের বহু প্রশংসায় অভিনন্দিত সেই প্রাচীন কাশীর পুরানো ঐতিহ্যকে বহন করবার জন্য আর নবজীবন দানের জন্যই যেন প্রচারিত হলো এই দুই নাম। 'আনন্দময়ী আশ্রম' আর 'আনন্দময়ী ঘাট'।

বহু সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্য মিশে আছে কাশীর এই ধূলিতে। সাধক ও পুণ্যার্থী যুগ যুগ ধরে ভালবেসে এসেছে কাশীর এই ধূলিকে আর পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে। তাইতো গঙ্গাতীরের এই আশ্রম আর ঘাট মহান তীর্থক্ষেত্র-স্বরূপ। দূরদূরান্তর থেকে পুণ্যকামী ভক্তেরা তীর্থ-যাত্রীদের মত এসেছে এই আশ্রমে আর ঐ ঘাটে স্নান করে হয়েছে পবিত্র। দর্শন করে ধন্য হয়েছে স্নেহময়ী জননীকে। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মাকে।

অবশেষে আনন্দময়ী মা চলে এলেন নবদ্বীপে। ভক্ত শ্রীযুত মনোরঞ্জন সরকারের আহ্বানে। এখন মায়ের জন্মোৎসব চলছে গোবিন্দ মন্দিরে। মায়ের আগমন সংবাদে দলে দলে ভক্তেরা ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলো শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নেবার জন্য। আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো নবদ্বীপধাম মায়ের আগমনে। নাম গান আর মা-মা কীর্তনে মেতে উঠলো গোবিন্দ মন্দির। সকাল সন্ধ্যা শত শত ভক্ত মেলায় হয়ে উঠলো মুখর। এ যেন কৃষ্ণ সমীপে স্বয়ং রাধারাণী হয়েছেন আবির্ভূতা। আর তাঁরই আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে গোপিনীরা। মায়ের সঙ্গে বিমলা মা ও নির্মলা মাও আছেন।

মা সমাজ বাড়িতে এসে দর্শন দিলেন সখীমাকে। সখীমা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি ত পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী, বের হতে পারি না। মা যদি কৃপা করে এসে মেয়েটাকে দেখে যান তবেই দর্শন পেতে পারি।'

অধিক রাত্রি পর্যন্ত মা ভক্তবৃন্দসহ কীর্তনে মেতে রইলেন।

দিনের পর দিন লীলাময়ী মা লীলা করে চললেন নবদ্বীপ ধামের পথে পথে মন্দিরে মন্দিরে। রাধাশ্যামের মন্দির দর্শন করে মা এলেন হরিসভায়। এখানে গৌরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সেবায়েত ভক্ত মুরারিবাবু। তিনি গৌর মূর্তিকে আনন্দময়ী মূর্তিতে সাজিয়ে রেখেছেন। মায়ের আগমনে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে বললেন, 'মা, গৌর আর তুই এক। গৌরকে যে পূর্ণিমার দিন কাপড় পরিয়ে দেবো তা তোর অঙ্গ স্পর্শ করিয়ে রাখবো।'

মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

অকস্মাৎ মা গৌরাঙ্গ মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মুখখানি ধরে নানা ভাবে আদর করতে লাগলেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তরা সে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন।

অবশেষে ভক্তবৃন্দের অনুরোধে আনন্দময়ী মা সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন শুরু করলেন ঃ

দুর্বলের বল হরি বল হরি বল।
আমি কি নিয়ে আর থাকব বল?
মন, হরি বল হরি বল।

* * *

শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠনিঃসৃত সেই দিব্য ভাবের সঙ্গীতে ভক্তপ্রাণে প্রবাহিত হয়ে চললো আনন্দের ধারা। সৌন্দর্য আর আনন্দ। আনন্দ···আনন্দ···আর আনন্দ। এইভাবে 'আনন্দময়ী মা' প্রেমময়ের লীলাভূমি নবদ্বীপ ধামের লীলা সাঙ্গ করে চলে এলেন ঢাকায়।

বহুদিন পর অকস্মাৎ মাকে পেয়ে ঢাকার ভক্তদের আনন্দ আর

ধরে না। সহস্র সহস্র ভক্তের আগমনে মুখর হয়ে উঠলো মাতৃ-মন্দিরাঙ্গন। শাহবাগে কিছু সময় অবস্থান করে, ভোলাগিরি আশ্রমে এলেন। এখানে এসে দর্শন দিলেন ভাইজীর স্ত্রীকে। অবশেষে শুরু হলো অমিয়-অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী। 'গতিশীল জগৎ। আজ শিশু, তারপর যুবা, পরে বৃদ্ধ—এই যে গতি, এই গতির মধ্যে কি করে আসবে স্থিতির ভাব? শান্তির ভাব? সংসারে কিছুতেই শান্তির আশা করা যেতে পারে না।

! সকলেই শান্তি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু এ কথা খুব কম লোকেই ভাবে যে 'তিনি' হৃদয়ে না জাগলে পূর্ণ শান্তি কিছুতেই পাওয়া যায় না। ধনে শান্তি হয় না, পুত্রপরিজনে শান্তি হয় না, প্রতিষ্ঠালাভেও শান্তি হয় না। কারণ সাংসারিক ভোগমাত্রেই দিনরাত্রির মত পরিবর্তনশীল, আসতে আসতে চলে যায়। এই কারণে এমন ধনে ধনী হওয়া আবশ্যক যার আর ক্ষয় নেই এবং যা পেলে সকল আকাঙ্ক্ষা একেবারে মিটে যায়। সে ধন একমাত্র ভগবান। যিনি সকলের হৃদয়ে থেকেও অপরিচিত আছেন। সৎ কর্মাদির দ্বারা চিত্তের অন্ধকার দূর হলে পরম সুন্দরের মোহন রূপ আপনা হতেই ফুটে ওঠে এবং চিত্তে পূর্ণ শান্তির রাজত্ব আরম্ভ হয়।'/

মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে ভাইজীর স্ত্রী ও অন্যান্য ভক্তিমতী স্ত্রী ও ভক্তরা মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন। এইভাবে মা আনন্দময়ী কিছুদিন ধরে ভক্তসনে লীলা করে চললেন। অবশেষে ভক্তদের একান্ত আগ্রহে এবং শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হলো বাবা ভোলা-নাথের মন্দির। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো ঢাকার ভক্তবৃন্দ। সে এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য। আবার অকস্মাৎ মা আনন্দময়ী ঢাকার ভক্তদের আনন্দের হাট ভেঙে চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে মা দর্শন দিলেন পরম বৈষ্ণব শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকে। বয়স ১০৮ বৎসর। বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সিদ্ধপুরুষ। বিদ্যাভূষণ মহাশয় হঠাৎ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করবার জন্য

ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে হরিবাবাও কলকাতায় এসেছেন। তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ পড়ে অভিভূত হন এবং তাঁকে দর্শন করার জন্য ব্যগ্র হয়ে শ্রীশ্রীমা সহ তাঁর গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে তাঁর গৃহে প্রবেশ করা সম্বন্ধে পরে মা বলেছিলেন, মায়ের ভাষায়, 'একটি শুকনা পাতা যে ভাবে উড়িয়া যায় এ দেহও প্রায় সেইভাবেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।'

বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীশ্রীমা ও হবিবাবাকে একত্রে নিজগৃহে পেয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। ভাবাবেগে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নানাভাবে মায়ের স্তুতি করলেন। অবশেষে আনন্দময়ী মাকে চিন্ময়ীমূর্তিতে দর্শন করে অভিভূত হয়ে বললেন—'ওগো জগজ্জননি! আমার ব্যাকুলতাই তোমাকে আমার এত কাছে টেনে এনেছে। আমি এখন বৃদ্ধ। অসুস্থ। কোথাও গিয়ে দর্শন কববাব ক্ষমতা নেই। সবই তোমার কৃপা মাগো।' স্নেহময়ী জননী বৃদ্ধেব কাছে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং প্রত্যুত্তবে সুমধুব স্মিতহাস্যে বললেন, 'ভক্তের টানে ভগবান বাধ্য হন। ইলেকট্রিক তাব যেমন স্পর্শ কবলে আব হাত ছাড়ানো যায় না, ঐ দিকেই টানে, সেইরূপ আর কি।'

এইভাবে শ্রীশ্রীমা হরিবাবাসহ কলকাতা ও আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে ভক্তসনে লীলা করে চললেন। বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে হবিবাবা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ দর্শন করতে এলেন আদ্যা-পীঠের আদ্যামূর্তি। শ্রীশ্রীআদ্যাশক্তি মূর্তি। মহাপীঠ আদ্যাপীঠ। শ্রীশ্রীআদ্যামায়ের লীলাভূমি। মাতৃপূজার পুণ্যক্ষেত্র। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের সাধনাক্ষেত্রের সন্নিকটে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীশ্রীঅন্নদা-ঠাকুর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এই আদ্যাপীঠ। ১৩২৮ সালে। আর আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৩৩৪ সালের এক পুণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। পরবৎসর শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের দেহাবসান হয় ৺পুরীধামে। তিনি রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নাদেশ কার্যে পরিণত করার

উদ্দেশ্যে কর্মে ব্রতী হন এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর বিমল অমিয় চরিত্রের পূত স্পর্শে পবিত্র হয়ে বহু ভক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে কর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁদের অন্যতম হলেন সিদ্ধেশ্বর ভাই, আনন্দভাই, নিরঞ্জনভাই, হেমভাই, দয়ালভাই আর জ্ঞানভাই। আর অন্নদাঠাকুরের সহধর্মিণী শ্রীশ্রী৺মণিকুন্তলা দেবীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে ওঠে মাতৃ-আশ্রম। ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিতা সাধিকাশ্রেণীর মায়েরা এখানে অবস্থান করেন। 'বিমলা মা' এই মাতৃ-আশ্রমের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

নানা উৎসবের আনন্দে মুখরিত এই আদ্যাপীঠ, মাতৃ-আশ্রম, আর ব্রহ্মচর্য বালকাশ্রম বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে শত শত পুণ্যকামী নরনারী এখানে এসে মিলিত হয়ে উৎসবের বিমল আনন্দ উপভোগ করেন।

এই পবিত্র কালীমায়ের পীঠস্থানে এসে আনন্দময়ী মা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে অনির্বচনীয় এক মূর্তি ধারণ করলেন। জ্যোতির্ময়ী সেই মাতৃমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্তবৃন্দরা। আনন্দময়ী মায়ের উপস্থিতিতে যে শুদ্ধসত্ত্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয় তা বর্ণনার বস্তু নয়। অনুভূতির বিষয়। শব্দব্রহ্মের স্বতঃস্ফূর্ত ঝঙ্কার মাতৃকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীতে একটি অভিনব স্পন্দনের সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিমতী বাণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে যায় মানস-মন্দিরে।

অবশেষে মা আনন্দময়ী বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে লীলা করে চলে এলেন পুরীধামে। স্বর্গদ্বারে। নূতন প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে। স্বর্গদ্বার আনন্দময়ী আশ্রমে।

চব্বিশ

'হে মাতাজী মেরা অবগুণ চিতে না ধরো।'

*   *   *

ভাবে বিভোর হয়ে গান গাইছেন মায়ের পুরানো ভক্ত শ্রীমতী হিরণবালা ঘোষ। আলমোড়ায়। বৃষ্টিসিক্ত সন্ধ্যায়। বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। ভিতরে ঘরে গাঢ় হয়ে উঠছে অন্ধকার। আর চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে শুধুই যেন সেই সঙ্গীতের মধুর তরঙ্গ বয়ে চলেছে। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হয়েছে সৃষ্টি। শ্রীশ্রীমা আত্মসমাহিত অবস্থায় ভক্তমণ্ডলী পরিবৃতা হয়ে বসে আছেন। আর সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা পবিত্র আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

সঙ্গীত শেষে ধীর গম্ভীর স্বরে শ্রীশ্রীমা বলছেন, আনন্দ, পরমপুরুষ বা আত্মা সকলই এক কথা। খাঁটি আনন্দ কাকে বলে জানো? যার জন্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর উপর নির্ভরের ভাব থাকে না,—যা স্বপ্রকাশ আপনাতে আপনি পূর্ণ, সত্য ও নিত্য। সংসারের রূপরসাদির ভোগে তোমরা সুখ পাও, কিন্তু সে তৃপ্তি আপাত-মধুর বা ক্ষণস্থায়ী বলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তোমাদের ছুটাছুটি কমে না। অন্তরের আনন্দ চাই। যিনি সকল রসের আধার। দৃঢ়তা ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁর রসে রসবান হবার সঙ্কল্প কর, তাহলে ইন্দ্রিয়াদির দাসানুদাস হয়ে ভিখারীর মত এ দুয়ারে সে দুয়ারে আর ঘুরতে হবে না।

মানুষ মাকড়সার মত জালের উপর জাল তৈরী করে, অনন্তকালের জন্য আপনাকে ঐ জালে জড়িত রাখতে চায়। ভোগ মোহাদির ভুলে পড়ে, একবার ভেবে দেখে না যে বারবার জন্মমৃত্যুর ঘাতপ্রতিঘাত কি

যন্ত্রণাদায়ক। বর্তমান জীবনেই কর্মবন্ধন শেষ করতে হবে,—এই অটুট সঙ্কল্প নিয়ে সেনাপতির মতো আপনার শক্তি বলে মায়াজাল ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা কর, অথবা অবরুদ্ধ সৈন্যদলের মতো বিশ্বপিতার নামে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকো, তিনিই তোমার ব্যবস্থা করবেন।

যা ভাল লাগে না, তা সহজে ত্যাগ করতে পারো ; যা অন্যায় মনে করো তা কেন ছাড়তে পারো না ? অন্যায়কে ন্যায় থেকে পৃথক করতে চেষ্টা করো। বিষের মত সেটাকে ঘৃণাভরে বর্জন কর, আর ন্যায় বা শুভ বাসনা পুঞ্জীকৃত করবার জন্য প্রতিনিয়ত সৎচিন্তার ও শুভ কর্মের আশ্রয়ে থাকো। নিজকে জয় করতে না পারলে, জগৎ জয় করলেও মুক্তির পথ দুর্লভ।

মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে মুগ্ধ হলেন ভক্তমণ্ডলী।

ভক্ত সাধন ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করলেন শ্রীশ্রীমাকে, আচ্ছা মা, ভগবানের কাছে আবার দোষ গুণ কি ? সকলই ত তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে।

মা মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'সকলই তাঁর ইচ্ছা' বলে যতক্ষণ বাইরে দোহাই দিয়ে চলবে, ততক্ষণ তোমার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে খেলছে মনে করবে। দেখো তাঁর ইচ্ছা যখন তোমার ভিতর এসে জায়গা পাবে, তখন তাঁর ইচ্ছা ও তোমার ইচ্ছা এমন মিলে মিশে থাকবে যে দুটিকে আলাদা করে চেনাই যাবে না। তোমার ইচ্ছা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বিহিত কর্মাদিতে তাঁর ইচ্ছার অনুগত হয়ে চলবে এবং ফলাফল সন্তুষ্ট মনে অকাতরে গ্রহণ করবে। ভগবৎ ইচ্ছায় অবিচারে আত্মসমর্পণ করাই শুদ্ধ প্রেমিকের ধর্ম। এরূপে এমন সময় আসবে, যেদিন তোমার ইচ্ছা বলে আর কিছুই থাকবে না। সকলই কেবল এক শক্তিময়ের খেলা বলে বাইরে ভিতরে অনুভূতি হবে। বস্তুতঃ এই বিচিত্র জগৎটির কোন উদ্দেশ্যই থাকে না, যদি না বুঝতে পারো যে আমরা সকলেই তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে অভেদরূপে মিলিত হবার জন্যই পলে পলে অগ্রসর হচ্ছি। আবার বলছেন, 'সকল কর্মে তিনি আছেন'—এই কথাও শোনায় বেশ ভাল।

কিন্তু সব কাজ আমরা এমন ভাবে করে থাকি যেন তা শেষ ইন্দ্রিয়-তর্পণমাত্র হয়ে পড়ে। দেখো না, এই কারণে হারজিতে আমাদের কত হাসি কান্না! যারা পরের চাকরি করে, ধনীর লাভ-লোকসানে তাদের তত মাথা ঘামে না। 'কর্মে শুধু তাঁরই সেবা হচ্ছে'—এই বুদ্ধিতে যে পারে স্থিতিলাভ করতে, সে কর্তব্য শেষ করে ফলাফলের আশায় ফিরে চায় না। কর্মের আরম্ভে মধ্যে ও শেষে তাঁর স্মৃতি চোখের সামনে রেখো, তাহলে সকল কর্ম তাঁকেই অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

এবারে শ্রীশ্রীহরিবাবা জানতে চাইলেন ঢাকার আশ্রমের কালীমূর্তির হাত ভেঙে গহনা চুরির ইতিবৃত্ত। শ্রীশ্রীমা হেসে হেসে বলছেন, চুরির দিন এ শরীর কক্সবাজারে ছিলো। সেই দিন সকাল বেলা হতেই নিজের শরীরের এক হাত দিয়ে অপর হাতখানা ভাঙবার বা কাটবার ভাব প্রকাশ হচ্ছিল। খুকুনি ভয়ে ভয়ে দা-ছুরি লুকিয়ে রেখেছিলো এবং এই শরীরটাকে ছেলেমানুষের মতো ভুলিয়ে রাখছিলো। কথাটা হলো এই যে চোরটার সকাল বেলা হতেই ঐ ভাবটা প্রবল হয়েছিলো। অবশ্য সে চুরি করলো রাত্রিতে, কিন্তু প্রাতঃকাল হতেই চুরি করবার ভাবটা প্রবলভাবে চলছিলো। চোরের ঐ ভাবটিই এই শরীরের মধ্যে এসে ঐ ভাবে প্রকাশ হচ্ছিল। কারণ ঐ চোরই বা কে? ঐ চোরও যে আমিই। কে কার হাত ভাঙবে? আমিই যে আমার হাত ভেঙে গহনা নিয়েছি। এক ছাড়া দুই কই?

কথাগুলি এমন সরল অথচ দৃঢ় ভাবে বললেন যে কারো মনে কোনরূপ সংশয়ের উদয় হলো না।

ভক্তদের অনুরোধে মা আবার বলছেন লঙ্কার গুঁড়া খাওয়ার গল্প বাবা ভোলানাথ মায়ের প্রথম জীবনে লঙ্কার গুঁড়া খেতে দিয়ে যে পরীক্ষার প্রচেষ্টা করেছিলেন তারই রহস্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত। ভক্তরা মায়ের কথা মায়ের শ্রীমুখ হতে শুনছেন।

আনন্দময়ী মা'র নিজের ভাষায়ঃ

'ঢাকাতে যখন কাজকর্ম আর বেশী করিতে পারিতাম না, শরীর সব সময় উঠিত না এই অবস্থা, তখন একটি ভদ্রলোক আমার মসলা বাটা ইত্যাদিতে কষ্ট হইবে বলিয়া, নিজে বাড়ি হইতে মসলা সব ধুইয়া গুঁড়া করিয়া আনিয়া দিত। একদিন সেই ভদ্রলোক মসলা গুঁড়া করিয়া শাহবাগে নিয়া আসিয়াছে। লঙ্কারও গুঁড়া আনিয়াছে। ভোলানাথ কথায় কথায় আমাকে বলিতেছেন, 'আচ্ছা, তোমার ত কিছুই লাগে না, লঙ্কার গুঁড়া খাইলেও লাগিবে না?' আমি অমনি বললাম, বেশ ত তোমার যখন মনে হইয়াছে, তখন খাওয়াইয়া দেখ না কি হয়। আমিও দেখি, তোমরাও দেখ। ভোলানাথ বলিলেন, 'চোখে জল আসিতে পারিবে না, বা শিশাইতে পারিবে না।' আমি মুঠার ভিতর যতটা ধরে, উঠাইয়া মুখে দিলাম। আমার মনে হইল যেন ছাতু খাইতেছি। কাজেই আমি খাইয়া বেশ বসিয়া আছি। কোনই পরিবর্তন হইল না। ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়া কাজকর্ম করিতে চলিয়া গেলাম।

তারপর হইল কি, ভোলানাথের যেমন জ্বর, তেমনই পেটজ্বালা। আবার আমিই সেবা করি। বড় ডাক্তারেরা দেখিতেছেন, কিছুই হইতেছে না। ১৮।১৯ দিন ধরিয়া দিন রাত্রি এমনভাবে বসিয়া সেবা হইয়া যাইতেছিল যে, এক মুহূর্তের জন্যও শরীরটা ঝিমাইত না। যেমন খাওয়া বন্ধ তেমনই ঘুম ও শোওয়া বন্ধ। একদিন রাত্রিতে যখন ভোলানাথের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল, তখন মটরী, আশু ও বাউল কাঁদিতে লাগিল। বিকার অবস্থায় ভোলানাথ উঠিয়া বসিয়াছেন, তখন মুখ হইতে বাহির হইল, 'তোমাকে কতবার বলিয়াছি, এ শরীরটাকে পরীক্ষা করিও না।' তখন ভোলানাথও বলিলেন—'আর করিব না।' তখন একটু ভিজা চিঁড়া জলে গুলিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ভোলানাথের খাওয়া একেবারেই ছিল না, অনবরত বমি হইতেছিল। চিঁড়া খাওয়াইবার পরই শুইয়া পড়িলেন। এই চিঁড়া কিন্তু পূর্বদিনই আনিয়া ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সারাদিন

কিছুই করা হয় নাই। এই সময়েই বাহির করিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। পরদিন হইতেই ভোলানাথের বমি বন্ধ হইয়া গেল। খুব জ্বর হইল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া উঠিল।'

গল্পশেষে মা বলছেন, 'তোমরা যেমন বাহির করিয়া নিতেছ তেমনই বাহির হইয়া যাইতেছে। আবার কেহ কেহ হয়ত এই সকল কথা শুনিয়া এ দেহের অসাক্ষাতে এ দেহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছে, 'আনন্দময়ী মা দেখি নিজের কথা নিজেই বলেন।' এই কথাগুলি বলে মা দেবদুর্লভ হাসি হাসতে লাগলেন। চিরজ্যোতির্ময়ী হাস্যমুখর এক মূর্তি ধারণ করলেন। ভক্তজনের সম্মুখে এক অপরূপ দিব্য মূর্তিতে হলেন প্রতিভাত।

আবার বলছেন হেসে হেসে, 'কিন্তু উহাদের দোষ নাই। উহারা ত বুঝিতে পারে না যে এ দেহের কাছে ভগবৎ চর্চাও যা এগুলিও তাই।'

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে এলো, আনন্দময়ী মা শয্যা গ্রহণ করলেন।

*　　　*　　　*

উর্জস্বল হোমশিখার মধ্যে যখন হবিধারা নিক্ষিপ্ত হয়, অগ্নির স্বাভাবিক নিয়মে অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। হবির্গন্ধে দিক পূত ও আমোদিত হয়ে যায়। একটু পরে আহুতির কোন চিহ্ন যজ্ঞানলে যায় না দেখা। শিখা চিরনির্মল দীপ্তি সহকারে জ্বলতে থাকে। তেমনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রাণপুটে ভক্তজনের নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলির স্পর্শে মাতৃ-স্তন্যের মতো স্বতঃ-উৎসারী স্নেহধারায় তাঁর বাণী, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর আনন অভিষিক্ত হয়ে ওঠে, ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং পরমুহূর্তেই তাঁর সহজাত প্রশান্ত সৌম্যমধুর দেহ-কান্তিতে সকলই যায় মিশে।

আনন্দময়ী মা এমনই এক সাধিকা, যোগিনী, যিনি সামাজিক লোক-ব্যবহারাদি রক্ষা করেও অধ্যাত্মরাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল ধর্ম সকল পথ সেই একেরই সন্ধানে রত।

পঁচিশ

হরি বল্‌তে কেন নয়ন ঝরে না,
শুনেছি পুরাণে সাধু গুরু স্থানে,
হরি নামের নাইকো তুলনা ॥

*　　　*　　　*

ভাবানন্দময়ী মা আনন্দময়ী তন্ময় হয়ে গান গাইছেন। দুই গণ্ড ভাসিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। অনাবিল সৌন্দর্যের জন্য শ্রীশ্রীমা'র অন্তর হতে উত্থিত হচ্ছে এই পবিত্র সঙ্গীত। সঙ্গীত নয় এ যেন সামগান। অপরূপ! অপূর্ব! গীতমুখর হয়ে উঠলো কাশীর আনন্দময়ী আশ্রম আর পুণ্যসলিলা গঙ্গার কূল।

সাবিত্রী যজ্ঞারম্ভ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা সোলন থেকে হঠাৎ চলে এসেছেন কাশীতে। মহাধুমধামের সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে যজ্ঞ। কোটি আহুতির সঙ্কল্প করা হয়েছে। ভক্ত ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, সদানন্দ ও নেপালদা যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন। (এই নেপালদাই পরবর্তীকালে আনন্দময়ী আশ্রমের নারায়ণস্বামী রূপে পরিগণিত হন।) আর এই মহাযজ্ঞের আচার্য হলেন শ্রীঅগ্নিস্বাত্ত্ব শাস্ত্রী (বাটুদা), যজমান নেপালদা ব্রহ্মা—ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত ও শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। (মায়ের স্নেহধন্য চিত্ত। মা-ই তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন।)

বাতাস হয়ে ওঠে ঘৃতগন্ধী মধুর। অগ্নিকুণ্ড শতশিখায় নাচতে শুরু করে দেয়। মনে হয় যেন আনন্দের মায়ামূর্তি। আনন্দ···আনন্দ আর আনন্দ। যজ্ঞশালার দ্বারে শুরু হয়েছে বেদপাঠ। বেদধ্বনি-মুখর যজ্ঞভূমি···আশ্রম···আর—প্রীতি-প্রবাহিণী গঙ্গার কূল।

ধীরে ধীরে অপরাহ্নের আলো হয়ে আসে ম্লান। নেমে আসে সন্ধ্যা। আশ্রমের গৃহকোণ থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসে "আনন্দময়ী

মার কণ্ঠনিঃসৃত সুস্বর মুখর দিব্য সঙ্গীত। মুক্ত বিহঙ্গমের মতন মহাশূন্যে ছুটে চলে আলোকমত্ত সে সঙ্গীত। আচ্ছন্ন করে ফেলে বাতাসকে। গঙ্গার জলতরঙ্গে বাজে উন্মাদ নৃত্যের ছন্দ। সে ছন্দ যেন বিজয়ীর মত বিশ্বকে দেয় দোলা। ভক্তহৃদয়ে জাগিয়ে তোলে অনির্বচনীয় এক মধুরিমা। তাদের অন্তর ভরে ওঠে অবিস্মরণীয় এক মাধুরীতে। দুঃখ বেদনা কোন ক্ষুদ্রতার কোন ভার আর নাই।··· নাই···নাই। কোথাও কিছু গ্লানি আর পড়ে নাই। শুধু আছে আনন্দ···আনন্দ আর আনন্দ। আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই এ বিশ্বভুবনে। ওগো মহানন্দ! আনন্দ অপার!

গান শুনতে শুনতে ভক্তদের দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। আর স্তব্ধ হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য গঙ্গার জলকলরোল। এ কেমন গান! এ কি অদ্ভুত গান! ভক্তরা অভিভূত হয়ে ভাবে মনে মনে।

শ্রীশ্রীহরিবাবা ভাবস্থ হলেন। হরিবাবার ভাবও অতি চমৎকার। মা'র প্রতি তাঁর বিশ্বাস অপূর্ব। অখণ্ড বিশ্বাস।

তিনি অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন, 'আমি দেরাদুনে গিয়ে মা'র একখানি ভাবের অবস্থার ফটো দেখেছিলাম ও কিছু কিছু তাঁর সম্বন্ধে শুনেছিলাম। তখন পর্যন্ত মা'র সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিলো যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবের বিষয় যা যা শুনেছি, মা'র মধ্যে যেন উহারই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। মহাপ্রভুর বিষয় শুধু পুস্তকেই পড়েছি, এবার সাক্ষাৎভাবে ঐসব মায়ের মধ্যেই দেখা গেল।'

ভাবস্থ অবস্থায়ই শ্রীশ্রীহরিবাবা ভক্ত মনোহরকে বলছেন, 'এবারে মহাপ্রভু গুপ্তভাবে এসেছেন। তিনিই আঁনন্দময়ী মা।'

অবশেষে শুরু হলো নামগান। কৃষ্ণকীর্তন। আনন্দময়ী কীর্তন। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তবৃন্দরা কীর্তন করতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এলো।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা ভক্তসনে লীলা করে চললেন কাশীর নূতন প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে—সাবিত্রী যজ্ঞকে উপলক্ষ্য করে।

* * *

সূর্যালোকে স্পন্দিত শীতের সকাল।

সাধু মহাত্মা ও ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে, দেবদুর্লভ হাসি হেসে মা আনন্দময়ী বলছেন, 'কর্মজগতের খেলা এক রকম, ভাবজগতের লীলা আর এক রকম। কর্মজগৎ প্রকাশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ভাবজগতের খেলা নীরব ও অপ্রকাশ। তা না হলে ভাবের পুষ্টি হয় না। আর এই ভাবের পুষ্টি নিয়েই চলে কর্মজগৎ। গঙ্গার উৎপত্তি স্থান লোকচক্ষুর অতীত গভীর অরণ্যে অথচ তাঁর স্নেহধারা কত দেশকে শস্যশ্যামলা করে তাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করছে। ভাবই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূল। কিন্তু যতদিন আপনা থেকে কর্মবন্ধন ত্যাগ না হয় এবং কর্মের অপেক্ষা রাখা হয় ততদিন কর্মের প্রাধান্য স্বীকার করা আবশ্যক। যার কর্মস্পৃহা আছে, কর্মব্যতিরেকে তার শ্রেয়োলাভ ঘটে না।'

আবার বলছেন, 'ভগবান ও জীবের নিত্য বিরহ আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। ভগবান সর্বদা জীবকে কোলে করবার জন্য প্রস্তুত। আর জীব আপন কর্মচক্রে পড়ে তাঁর ভিতর থেকেও অন্ধের মতো তাঁকে দেখেও না, খোঁজেও না। সাধন ভজনে অনুরাগী হলে দেখা যায়, এই বিরহ বা বিচ্ছেদই মিলনের সেতু এবং ইহা আনন্দেরই উৎস খুলে দেয়। মিলনের আশা মিলনের চেয়েও সুখকর এবং যতই শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়তে থাকে ততই এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ব্যাকুলতা প্রার্থনা ইত্যাদি পূর্ণতায় পৌঁছায়। বিরহ বা অভাববোধ নিতান্ত আবশ্যক। অভাবের তাড়নায় যেমন প্রবল বেগে কর্মসংগ্রাম আরম্ভ হয়, কর্তব্য বুদ্ধিতে তেমন হয় না। অভাব স্মরণে রেখে সদ্ভাবে তাহা পূরণের চেষ্টা করো। এইভাবে সদবৃত্তি যতই বৃদ্ধি পাবে ততই তাঁর বিরহ তোমাকে অন্যসব কর্ম হতে বিরত করে তাঁর প্রতি শরণাগতি এনে দেবে।'

যজ্ঞশালায় শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর ছবি আসনে প্রতিষ্ঠিত করে শুরু হলো নামযজ্ঞ। উদয়াস্ত কীর্তন। কৃষ্ণকীর্তনে মুখর হয়ে উঠলো যজ্ঞশালা, আশ্রম আর বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস। শ্রীশ্রীহরিবাবা নাম সংকীর্তন করতে করতে নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। কৃষ্ণ ভিন্ন সে হৃদয়ে যেন আর কিছুই নাই।

অকস্মাৎ শ্রীশ্রীহরিবাবা প্রেমনেত্রে আনন্দময়ী মাকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া রূপে অপ্রাকৃতভাবে দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

অবশেষে হরিবাবা পূজা করলেন শ্রীশ্রীমাকে। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মাকে। জগজ্জননী সন্তানের পূজা গ্রহণ করলেন। ভক্তরা ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে ফেললেন দুজনকে। ফুল মালায় বিভূষিত হলেন শ্রীশ্রীহরিবাবা ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীমা'র ভোগ হলো। মা প্রসাদ বিতরণ করলেন ভক্তদের। আনন্দময়ী বিতরণ করলেন 'আনন্দময়ী ভাত'। পুরীধামে জগন্নাথের প্রসাদ বিতরণ করে যেমন ভক্তদের আনন্দ দান করেছিলেন, বৃন্দবনধামে 'আনন্দময়ী ভাত' বিতরণ করে এখানকার ভক্তদেরও তেমনই আনন্দ দান করলেন। শ্রীশ্রীহরিবাবা, শ্রীশ্রীউড়িয়া-বাবা ও অন্যান্য ভক্তজনেরা একে একে এসে মায়ের শ্রীহস্ত থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন। শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণারূপে সকলকে অন্ন দিতে লাগলেন। তখন মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল এক অলৌকিক উজ্জ্বল ভাব ধারণ করলো। সহসা সুধা-জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলৌকিক ভাবে বিভাসিত হয়ে উঠলো। বৃন্দাবনের সকল মধুরিমাই যুগপৎ প্রকাশিত হলো।

লীলাময়ী মা লীলা করে চলেছেন ভক্তসনে। বৃন্দাবনধাম থেকে মা এলেন ঝুসীতে। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীর আহ্বানে। তাঁর আশ্রমে। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী মায়ের পরম ভক্ত। মাকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। নাম-গানে মেতে উঠলেন। আনন্দময়ী কীর্তনে মুখর হয়ে উঠলো আশ্রম।

ঝুসী থেকে কাশীর আশ্রমে এলেন। কয়েকদিন কাশীতে থেকে শ্রীশ্রীমা কুচবিহারের পথে রওনা হলেন। আবার যাত্রা হলো শুরু। মায়ের পথ চলার আর বিরাম নেই। কুচবিহারের পথে হঠাৎ কলকাতায় এসেছেন। আশ্রমে উঠে অল্প সময় বিশ্রাম করেই চলে এলেন ভক্ত-প্রবর শ্রীযুত চারুকুমার ঘোষ মহাশয়ের ডোভার লেনের বাড়িতে। নূতন বাড়িতে ভক্ত চারুবাবু শ্রীশ্রীমা সহ গৃহেপ্রবেশ করলেন। বাড়ি তৈরী করে এতদিন বাস করেননি। মায়ের পদধূলির অপেক্ষায় ছিলেন। মাকে সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে ডাকতেন। মা হঠাৎ এসে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। চারুবাবুর আনন্দ আর ধবে না। চারুবাবু রায় বাহাত্বর যোগেশ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। অধিকাংশ সময়ই তিনি মাতৃনামে বিভোর হয়ে থাকেন। মাও তাঁকে খুবই স্নেহ করেন।

কলকাতা থেকে মা ভক্তবৃন্দসহ গেলেন কাটোয়াতে ভক্ত ভোলা-নাথের বাড়িতে। ভক্তপ্রবর ভোলানাথও অনেকদিন ধরে মাকে আশা করেছিলেন নিজ গৃহে। হঠাৎ মাকে কাছে পেযে ভক্ত ভোলানাথ নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলে মনে করতে লাগলেন। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো গৃহস্থ ভক্ত ভোলানাথের গৃহ।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা এসে পেঁছুলেন কুচবিহাবে। ১লা ফাল্গুন। ১৩৫৩ সন। ভক্ত রায়বাহাত্বর শ্রীযুত যামিনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভক্তপ্রবর শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েব একান্ত আগ্রহে ও আহ্বানে মা এসেছেন। তাঁরাই মায়ের থাকবার সুবন্দোবস্ত করেছেন। মায়ের আগমনে সমস্ত কুচবিহার প্লাবিত হয়ে উঠলো। দিকে দিকে প্রচারিত হলো মায়ের আগমন সংবাদ। দলে দলে ভক্তরা এসে মায়ের চরণধূলি প্রার্থনা করলো। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ। লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার মানুষ দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে আনন্দময়ী মায়ের চরণ-ধূলি মাথায় নেবার জন্য আর শ্রীমুখের কথামৃত পান করবার জন্য।

মা বলছেন, 'কেউ কাউকে দেখে না। সকলকে দেখেন মাত্র

একজন। মহাপর্বতের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখতে পাবে, পাথর, মাটি, গাছ, শিকড়, লতা প্রত্যেকে প্রত্যেককে এমন ভাবে আঁকড়িয়ে রেখেছে, যে মনে হবে, একটি খসলেই বুঝি সবগুলি খসে পড়বে। কিন্তু তা কি হয়? যে পর্বতের গায়ে তারা লেগে আছে সেই তাদের ধরে রেখেছে। ভূমিকম্প বা অন্য কোন দৈবোৎপাতে যদি একবার গা ঝাড়া দেয়, তবে আর কিছুই স্থির থাকবে না। সেইরূপ যদিও তোমরা মনে কর সংসার সমাজ সভ্যতা ইত্যাদির গঠনে তোমরাই জগৎ রক্ষা করছো, মূলে কিন্তু তিনিই সর্বময় রক্ষাকর্তা এ কারণে তাঁকে জানা দরকার। তাঁকে জানলেই সব জানা হয়। অভাবের দ্বন্দ্ব দূর হয়।

আবার বলছেন, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ। মানবজন্ম সব জন্মের সেরা। মানুষের মনোরাজ্যে এমন সব গুপ্ত সম্পদ নিহিত রয়েছে যা জগতের আর কোথাও নেই। ডুবুরীর মত নিজের অন্তরের গভীরতায় ডুবে অহর্নিশি সেইসব রত্ন উদ্ধারের যত্ন কর। অন্তরের জ্বলদগ্নি প্রকাশ করে জীবন ও জগৎকে কর আলোকিত। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে কুচবিহারের ভক্তরা মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। তারপর শুরু হলো নামযজ্ঞ। নামগান। আনন্দময়ীর কীর্তন। মা-মা-মা কীর্তনে মুখর হয়ে উঠলো মাতৃমন্দির, কুচবিহারের আকাশ বাতাস।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা কুচবিহারে ভক্তসনে লীলা করে চললেন দিনের পর দিন। কুচবিহারের ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো কৃষ্ণনাম। মাতৃ-নাম। বিশ্বজননী আনন্দময়ী নাম। ভক্তিমতী স্ত্রীরা সন্ধ্যায় মায়ের ছবিতে আরতি করতে লাগলেন। মা শুনে বললেন, 'এ শরীরটা ত সকলেরই আপনজন। সেই জন্যই ত এরূপ হয়। সবই যে এক।'

অকস্মাৎ মা কুচবিহারের ভক্তমণ্ডলীর এই আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে আবার যাত্রা করলেন কাশীর পথে।

ছাব্বিশ

প্রকৃতি দেবী আজ অপরূপ এক মূর্তিতে হয়েছেন প্রতিভাত। জ্যোৎস্নালোকে শুভ্রবসনা মহিমময়ীর মতো দেখাচ্ছে। প্রশান্ত সন্ধ্যে-বেলায় নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে বিন্ধ্যাচলের আশ্রম। হু হু করে বাতাস বয়ে চলেছে। খানিকটা চুপ করে কান পেতে থাকলে বাতাসের একটা মধুর শব্দ কর্ণগোচর হয়। সে শব্দ ঠিক বাতাসের নয়, বাতাস হতে উত্থিত কোনও শব্দ নয়। সে শব্দ নূপুর নাদের। নূপুরের মধুর শব্দ। বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীরাধিকার চরণকমলের নূপুর ধ্বনি। সে শব্দ শুনে ভক্তরা বিস্মিত হয়ে চমকে ওঠেন—আর মা আনন্দময়ী মৃদু মৃদু হাসেন। মা-ই জানেন মায়ের কি লীলা।

এমনই এক প্রশান্ত সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা বিন্ধ্যাচল আশ্রমের দোতলার দক্ষিণদিকের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ পরিবৃতা হয়ে বসে আছেন। ভক্তরা প্রশ্ন করছেন, মা হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছেন। আবার মাও তাঁর বধূ জীবনের নানা ইতিবৃত্ত কাব্যায়িত করে বলছেন। কথা প্রসঙ্গে সাপের গল্প উঠলো। রায়পুরে পরমানন্দ স্বামীজীকে যে সাপে কামড়াতে এসেছিলো সেই কথা ভক্তরা শুনতে চাইলেন, মা বলতে লাগলেন, আনন্দময়ী মা'র ভাষায় ঃ

'সেবার যখন রায়পুরে উঠিতেছি তখনই মুখ হইতে বাহির হইল 'মৃত দেহ'। তারপর ঐ পুরানো ঘরটিতে থাকা হইল। আমি এক কোঠায়, পরের কোঠাতে পরমানন্দ এবং শিশির রাহা। তার পরের একটি ছোট কোঠায় ভাঁড়ার ছিল। একদিন ছাদের মধ্যে একটা সাপ দেখা গেল। ঐখানকার একজন বলিল যে আমরা রায়পুর আসিবার পূর্বেই একটা সাপ এই ঘরে ঢুকিয়াছে। আমরা প্রায় এক মাস যাবৎ আছি। মাঝে মাঝে সাপটাকে ছাদ হইতে ঝুলিয়া পড়িতে দেখা যায়।

পরমানন্দ যে ঘরে থাকিত সেই ঘরেই সাপটা ছাদ হইতে ঝুলিয়া পড়িত, আবার উঠিয়া যাইত। আমি কয়েকদিন যাবৎ কিষণপুরে যাওয়ার কথা উহাদিগকে বলিতেছি, কেন না উহাদের ঘরেই সাপ দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহারা কিষণপুরে যাইতে চায় না।

একদিন সাপটার মধ্যে একটা অস্থির ভাব দেখা গেল। একবার সে এদিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে, আবার উঠিয়া গিয়া অন্য দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া পরমানন্দ সাপটা আবার বাহির হইতেই উহাকে শাবল দিয়া একটা খোঁচা দিল। সাপটার বিশেষ কিছু হইল না, উহা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। তখনই বলা হইল সাপটা আঘাত পাইল, ঠিক হইল না। রাত্রিতে সকলে শুইয়া আছে, আমি বসিয়া আছি। কেমন খেয়াল হইতেছে যে সাপটা আজ নামিবে এবং একটা কিছু হইবে। তারপর আবার খেয়াল হইল যে সাপটা যেন পরমানন্দের পায়ের বুড়া আঙ্গুলে কাটিল। আবার খেয়ালে আসিল কিছু হইবে না। তখন শুইয়া পড়া হইল।

এদিকে পরমানন্দের ঘুমের মধ্যে মনে হইল যে তাহার পায়ের বুড়া আঙুলে সাপটা কামড়াইয়া দিয়াছে। তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং উঠিয়া বসিয়া আঙুল পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে কিছু হয় নাই, তখন সে আবার শুইয়া পড়িল। প্রায় এক ঘণ্টা পর আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার মনে হইতেছিল যে সাপটা যেন আবার আসিতেছে। চাহিয়া দেখে সত্যি সাপটা উপর হইতে নীচে পড়িয়াছে। পরমানন্দ মনে করিল যদি সাপটা অন্যদিকে চলিয়া যায় তবে আর কিছু বলিবে না। কিন্তু সাপটা ওর দিকেই আসিতে লাগিল। তখন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া শাবল দিয়া সাপটার মাথায় আঘাত করিল। ঐ আঘাতেই সাপটা মরিয়া গেল। পরমানন্দ শুইবার সময় একটা শাবল লইয়া শুইত। অভয় আমার ঘরের দরজায় ছিল। সে জাগিয়া উঠিল। সকলেই জাগিয়া উঠিল। কথা হইল কি জান? ঐ যে মৃত দেহ দেখা হইয়াছিল—হয় ওর (স্বামী পরমানন্দ)

শরীরই সর্পাঘাতে মৃত হইয়া যাইত, তাহা না হইয়া সাপের দেহটাই মৃত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।'

এই রোমাঞ্চকর নাটকীয় কাহিনী শুনে ভক্তরাও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। কিছু সময় সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন—লীলাময়ী মায়ের লীলার কথা চিন্তা করে। মা যে কখন কাকে কিভাবে রক্ষা করেন মা-ই জানেন। মা যে করুণাময়ী—করুণা-সিন্ধু।

এমন সময় মির্জাপুর থেকে ভক্তরা হারমনিয়াম সহ এসে উপস্থিত হলেন। মহানন্দে শুরু হলো কৃষ্ণ-কীর্তন। ভক্তরা মেতে রইলেন আনন্দ-কীর্তনে। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও ভাবের বিরাম নেই। এক এক সময় এক এক ভাবে হতে লাগলেন প্রতিভাত। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এলো। মহানিশায় মা ধীরে ধীরে উঠে এসে ষষ্ঠী-তলায় ধ্যানে বসলেন। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হলেন। কয়েকজন ভক্তও মায়ের সঙ্গে এসে ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন অলৌকিক কিছু দর্শনের আশায়। অলৌকিক কিছু দর্শন না হলেও ভক্তরা মায়ের নিকটস্থ হয়ে অনুভব করলেন বিচিত্র এক স্পন্দন। সমস্ত দেহে। অপ্রাকৃত এক আনন্দের ফোয়ারা সমস্ত অন্তরকে করে তুললো আলোড়িত···আনন্দ···আর আনন্দ। পরমানন্দের আভাস উপলব্ধি করলেন তাঁরা মনে মনে। বিচিত্র সে শক্তি! বিচিত্র সে আনন্দ!

পরের দিন শ্রীশ্রীমা অলৌকিক দর্শনের কথা শুনে বলেছিলেন, 'লৌকিক অলৌকিকের কোন প্রশ্ন নাই। তোমরা সৎপথে থেকে সৎকাজ করবার চেষ্টা করো। যদি এই পথে কোন মহাত্মার সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ ঘটে তবে বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সেবা করে তাঁর কৃপা ও আনুকূল্যে সাক্ষাৎ কর্মের চেষ্টা করা আবশ্যক। ভগবানকে সর্বদা সম্মুখে রেখে সাধু মহাজনের উপদেশাদি অনুসরণ করে চললেই সবকিছু লাভ হয়। জীবনে সার্থকতা আসে।

—'শক্তি দাও', 'শক্তি দাও' বলে চেঁচালে শক্তি লাভ হয় না।

হাসপাতালে রোগীদের আনন্দ, আরাম দেবার জন্য কত রকম সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা হলেও ভিতরের রোগের জ্বালা বাইরের ব্যবস্থায় কি কখনো দূর হতে পারে? ভিতরের ব্যবস্থা চাই। এবং ইহা প্রত্যেকের নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। শাস্ত্র ও সাধু বাক্য মনের মধ্যে ধারণ করে কাজ করে যাও। শক্তি সময়ে তোমার ভিতর হতেই দেখা দেবে। কাজে যাদের কর্তব্য বুদ্ধি ও দৃঢ় সঙ্কল্প নেই, তারাই অন্যের নিকট শক্তি খুঁজে বেড়ায়। সংসারের সকল কাজ যদি অহং-এর বলে চালাতে পারো, ভগবৎ চিন্তার বেলাই কি কেবল শক্তি চাই? ধৈর্য ও বিশ্বাস নিয়ে সৎকার্যে মনোযোগ করো, শক্তি আপনি উদয় হবে। আর যদি বল কাজ ত করতে পারি না তবে কেন পারো না, সে অন্তরায়গুলি অনুসন্ধান করে দৃঢ় মনে উচ্ছেদ করো। নতুবা তোমার ভিতর তুমিই কেবল ভূতের বোঝা বাড়াবে। আর বাইরের শক্তি এসে তোমাকে গাধাবোটের মত টেনে নিয়ে যাবে। এও কি কখনো সম্ভব? আঁকাবাঁকা পথে যেমন গাড়ির চাকা ঘুরাতে ফেরাতে ঘোড়া বা ইঞ্জিনের উপর জোর দিতে হয়, সেই রকম বিষয়াসক্ত মনকেও সঙ্কল্পের দ্বারা মুচড়ে ধর্মকাজে লাগাতে হয়।'

অবশেষে শুরু হলো নাম-যজ্ঞ। আনন্দ-কীর্তন। মা যখন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই বসে যায় আনন্দের হাট।

ইতিমধ্যে ভক্তরা কালীখো দর্শন করে এলেন। কালীমূর্তি হাঁ করে আছেন। দর্শন করলে মুখে কিছু দিতে হয় তাই নাম হয়েছে 'কালীখো'। এ অঞ্চলের বিখ্যাত দেবীমূর্তি। ঢাকায় শ্রীশ্রীমাকেও বলতো 'কালীখো' 'মানুষ কালী'।

সকাল গেলো, দুপুর গেলো। সন্ধ্যাও অতিক্রান্ত হলো। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো রাত্রি। সাধক ভালবাসেন মধ্যরাত্রির এই অন্ধকারকে। পরমযোগিনী সাধিকা আনন্দময়ী মা কয়েকজন ভক্তসহ ধীরে ধীরে এসে বসলেন ষষ্ঠীতলার বেদীতে। ধ্যানস্থ হলেন। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ধ্যানস্থ অবস্থায়ই অকস্মাৎ দর্শন করলেন এক

অভাবনীয় দৃশ্য। যে স্থানে বিন্ধ্যবাসিনায় ছিল সেখান হতেও একটা প্রভাব এসে যষ্ঠীতলার বেদীর চারিদিকে কালোছায়ার মত ঘিরে ফেললো। এই অপ্রাকৃত শক্তি দর্শন করে মায়ের নিজের ভিতর থেকেই প্রশ্ন হলো—ঐ দিক থেকে প্রভাবটা এলো কেন? উত্তর মিললো—ঐ স্থানে দেবীর প্রভাব আছে বলে। অবশেষে দর্শন করলেন রুদ্রাক্ষধারী মহাত্মাদের। মহা মহা ঋষিদের। এবং একজন মহান্ যোগীকে যাঁর বদনমণ্ডল ব্রহ্মানন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। আবার অনুভব করলেন গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল কি যেন কি মধুর উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে অমৃত আস্বাদনের জন্য অনন্তের পথে চলেছে ছুটে। তারপর 'অব্যক্তং অচিন্ত্যং অনির্বচনীয়ং' অবস্থা—এইরূপ স্থির নিশ্চল নিস্পন্দভাবে বহুক্ষণ অতীত হয়ে গেলো।

শ্রীশ্রীমা ঐ যোগীর সম্বন্ধে পরে ভক্তদের বলেছিলেন, 'দেখলাম চমৎকার মুক্তিগতিটা। যোগী আসন করে বসা। পরিধেয় কোনও বস্ত্র দেখা গেল না। দাড়ি গোঁফও উঠে নাই, কিন্তু গোঁফের স্থানে এবং অন্যান্য স্থানেও জ্যোতিঃরেখার মত। তিনি কয়েকটি ধ্বনি করলেন। উহাতেই সব বুঝা গেল। প্রথমে বললেন, 'বিলোমগতি', তারপর—'স্বকৃত'। তারপর—'সত্যনাদ আশ্রয়ে আছি।' ইতিমধ্যে একবার 'স্পর্শ' ও 'আনন্দ'ও বললেন।

এই কথাগুলির মা আবার নিজেই ব্যাখ্যা করলেন,—'বিলোমগতি' অর্থাৎ বহির্মুখ গতি হতে অন্তর্মুখ গতিতে যাচ্ছে। 'স্বকৃত' অর্থাৎ নিজেরই কৃত। 'সত্যনাদ' কিনা স্বাভাবিক নাদ। অর্থাৎ সাধনা বা চেষ্টা দ্বারা তার এই নাদ শুনতে হয় না। ঐ নাদের আশ্রয়ে আছে। একবার যে 'স্পর্শ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার অর্থ হলো মাও ত বসে আছেন, তাঁর স্পর্শ পাচ্ছে, কথাবার্তায়ও একটা যোগ হচ্ছে।

বিন্ধ্যাচল আশ্রমে এই ভাবে দিনের পর দিন শ্রীশ্রীমা ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন। অধিকাংশ সময়েই অব্যক্ত অনির্বচনীয় ভাবে বিভোর হন।

সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ পরমাত্মার সঙ্গে যুক্তাত্মা হয়ে নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল এক মধুর উজ্জ্বল প্রভায় হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। ব্রহ্মানন্দময়ী আনন্দময়ীর সেই অপরূপ শুদ্ধ-মাধুর্যময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হন ভক্তমণ্ডলী।

শ্রীশ্রীমা বলছেন, সংসারের জন্য যেমন কাঁদছো তার চেয়ে ঢের বেশী কাঁদতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে যখন বাহির ও অন্তর এক হয়ে যাবে তখন দেখবে যাঁকে একদিন এমন করে খুঁজেছো, তিনি সকলের প্রাণরূপে অতি নিকটেই বিরাজিত রয়েছেন।

সাতাশ

কিষণপুর আশ্রম। মানুষের সৃষ্ট কোনও বাড়ি নয়। গৃহ নয়। মন্দিরও নয়। এ যেন গিরিরাজ হিমালয় কন্যা পার্বতী 'স্বয়ং শিবের তপস্যায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তপস্বিনী পার্বতীর নিরাভরণা এক মাধুর্য-ময়ী মূর্তি। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আশ্রমটি এমনই এক অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে প্রতিভাত হচ্ছিল। কি অপূর্ব! কি অপরূপ!

গ্রীষ্মের নূতন দিন। বাতাস ছিল ক্লান্ত। ঈষতুষ্ণ আকাশ উজ্জ্বল। হঠাৎ আকাশের বুকে বাতাস বইলো। সঞ্চালিত হলো বরফের মতো সাদা পুঞ্জীভূত মেঘগুলো। মেঘের দল গেলো ভেসে। পাহাড়-উপ-ত্যকা আলোকে আঁধারে হলো অভূতপূর্ব সুস্পষ্ট। ক্ষণিক আলো ক্ষণিক ছায়া। বিহগকুল অবিশ্রান্ত কলরব কূজন শুরু করে দিলো। পাহাড়ের উপর থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে এলো বুনো ফুলের মিশ্রিত গন্ধ।

গ্রীষ্মের এমনই এক সুন্দর দিনে আনন্দময়ী মা কিষণপুর আশ্রমের একটি প্রকোষ্ঠে ধ্যানমগ্ন। এক তন্ময়ভাবে তিনি মগ্ন। তাঁর হৃদয়তন্ত্রী

কার মধুর স্পর্শে যেন এক অতি সুমধুর তালে উঠলো বেজে। তাঁর মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেলো। মনে হতে লাগলো জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ চৈতন্যময় আর সে আনন্দের আধার তিনি নিজে স্বয়ং। বৃক্ষলতা পাহাড় পর্বত আকাশ বায়ু জলস্থল সকলই যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ। সে আনন্দের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। সীমাহীন আনন্দ। আনন্দ…আনন্দ…আনন্দ।

এই ভাবে কতক্ষণ ছিলেন, তাঁর বোধ ছিল না, কিন্তু যখন তাঁর চেতনা ফিরে এলো, ধ্যান ভঙ্গ হলো, তখন দেখলেন সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আর বল্লভভাই প্যাটেল। মৃদু হেসে শ্রীশ্রীমা তাঁদের বসতে বললেন। ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ভারতমাতার দুই সু-সন্তানকে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তখনও মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছেন আনন্দময়ী মায়ের প্রতি। বিশ্বজননীর সেই ধ্যান-মগ্ন অপরূপ মূর্তি নয়নগোচর করে তিনি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছেন। এ কি মানবী না দেবীমূর্তি?

রাজরাজেশ্বরী নয়, নিরাভরণা এক সন্ন্যাসিনীর দুই প্রশান্ত চক্ষু তখনও তাকিয়ে আছে তাঁরই মনের দিকে। ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মনের দিকে। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে জহরলালের চোখের দৃষ্টি। মনে হয়, তাঁর বুকেরই ভিতরে অনেক-দিনের নির্বাসিত এক বন্দী নিঃশ্বাসের বাতাস যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিজেকে নিজেই শাসন করেন। দুর্বলতা নয়। ক্ষণিকের মোহগ্রস্ত মনের দুর্বলতাও নয়। হ্যাঁ—ইনিই ছিলেন কমলা নেহরুর জীবন দেবতা। প্রাণের ঠাকুর। ধ্যান জপ মন্ত্র। সবকিছু। সত্যই ইনি দেবী। মহাদেবী। মহামায়া।

দুর্বলতা! কিন্তু সে দুর্বলতার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না জহরলাল। বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো তাঁর দুই চোখ। এ কোন রাজনীতিবিদের চোখ নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন যোদ্ধার চোখও নয়। ভাবুকের চোখ। Discovery of India'র লেখকের চোখ,

থাক—'জয় জগদীশ হরে'। এই রকম করতে করতে এক গান ছাড়া তোমার আর কিছুই ভাল লাগবে না।'

মায়ের মুখনিঃসৃত উপদেশামৃত শ্রবণ করে ভক্ত-সেবা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন।

অকস্মাৎ লীলাময়ী মা চলে এলেন কসৌলীতে। কসৌলীর ভক্তবৃন্দের আহ্বানে। শত শত নরনারী ফুল মালা শঙ্খ ঘণ্টা হাতে নিয়ে মায়ের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। মায়ের গাড়ি পৌঁছানো মাত্রই তারা জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করে শ্রীশ্রীমাকে রিক্‌শায় বসিয়ে নিজেরাই বাজারের মধ্য দিয়ে রিক্‌শা টেনে প্রায় আধ মাইল দূরে এক মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেখানেই দেবীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা আরতি ও ভোগ হলো। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো কসৌলীর শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতী স্ত্রী পুরুষ সকলেই। অভাবনীয় সে দৃশ্য। মায়ের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব বর্ণনাতীত। সরল ধর্মপ্রাণ কসৌলীর মানুষ শ্রীশ্রীমা'কে জীবন্ত ভগবতী রূপে পূজা করে ধন্য হলেন।

কসৌলীর ভক্তদের সদ্য গড়ে ওঠা আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে, মা আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন চিরদিনের লীলাপথে।

কানপুরের গঙ্গাতীরে একদিন অবস্থান করে লক্ষ্ণৌ হয়ে আবার ফিরে এলেন কাশীর আশ্রমে। কাশীর আশ্রমে তখন নামযজ্ঞ চলছে, সর্বদা সদালোচনা, সৎসঙ্গ। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী এসেছেন। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভজন করছেন। অপূর্ব মধুর সুরতান সমন্বিত সে সঙ্গীত। কি প্রাচুর্য কি শক্তি! কি আনন্দ!

প্রাণশক্তির কি উচ্ছলতা সে সঙ্গীতে! কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিণীর মত সে সঙ্গীত বাতাসের বুকে ভেসে চলেছে অনন্তের পথে···।

সঙ্গীত শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীমা ভাবস্থ হলেন। ভাবসমাধি।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা ঝুলন জন্মাষ্টমী উৎসবে মেতে রইলেন কাশীতে

তারপর এলাহাবাদ ফয়জাবাদ কানপুর বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে লীলা করে দুর্গাপূজার সময় চলে এলেন জলপাইগুড়িতে। ভক্ত নাড়ুবাবুর আহ্বানে। জলপাইগুড়িতে এসে উঠেলন কালীবাড়িতে। কালীবাড়ির সেবাইতের বিধবা পুত্রবধূ যোগেশ্বরী দেবী প্রাণেব দরদ দিয়ে মাকে সেবা করতে লাগলেন। সমস্ত জলপাইগুড়ি শহর আবার মেতে উঠলো মায়ের আগমনে। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল গোবিন্দবাবু স্ত্রীসহ মাকে দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে ভক্তমণ্ডলীকে বললেন, 'মহাপুরুষেরা যাঁকে দর্শন করবার জন্য সাধনা করেন ইনিই তিনি। এই কথা বিশ্বাস করবেন।'

অষ্টগ্রামের সারদাবাবু (শ্রীযুত সারদাশঙ্কর সেন) তখন জলপাইগুড়িতে ছিলেন। তিনি মহানন্দে মাকে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। সারদাবাবুর মা শ্রীশ্রীমাকে বলতেন 'খুসীর মা'। সেই পূর্ব কথা নিয়ে সকলেই আনন্দে মেতে রইলেন। মা সারদাবাবুর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কিগো, তুমি সারদার ব্রত ভঙ্গ করলে? তুমি সহধর্মিণী, স্বামীর ধর্মের সহায় হইও।' সারদাবাবু বললেন, 'একটু জড়াইয়া পড়িয়াছি। তুমি টানিয়া নিও।' মা মৃদু হেসে প্রত্যুত্তরে বললেন 'ঐ দিকে খেয়ালটা রাখিও।'

লীলাময়ী মা লীলা করতে লাগলেন গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে। অবশেষে মা চলে এলেন বোদা গ্রামে ভক্ত নাড়ুবাবুর বাড়িতে। মায়ের আগমনে সমস্ত গ্রাম মেতে উঠলো। স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে মাকে আরাধনা করলেন। হিন্দু মুসলমান মিলিত ভাবে শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে লাগলেন। অভাবনীয় সে দৃশ্য।

একজন মুসলমান ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা মা, এই সব কুমারী পূজা, মূর্তি পূজা ইত্যাদি নানা পূজা করে কুসংস্কার বাড়ান কেন? একজনই ত আছেন। এ সব আর কেন? এতে ত কুসংস্কার কোন দিনই যাবে না?

শ্রীশ্রীমা প্রত্যুত্তরে হেসে হেসে বলছেন, 'বাবা, সকলের ত এক রাস্তা নয়। এরা এইভাবে নানাজনের মধ্যেই সেই একজনকে পেতে চেষ্টা করছে। নেতি নেতি বিচারও আছে আবার ইতি ইতি বিচারও ত আছে। সকলে সেই এককেই চাচ্ছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন পথ।'

কথা প্রসঙ্গে মা আবার বলছেন শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। শ্রাদ্ধ করলে মৃত ব্যক্তিরা পাবেন না কেন? নিশ্চয়ই পাবেন। এখানে যেমন তোমরা বেতার টেলিফোন ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে কাজ কর, ঐরূপ কাজ যন্ত্র এবং শ্রদ্ধার সাহায্যেও হয়।

এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্পের অবতারণা করলেন, এক সাধু এবং একজন ব্রাহ্মণ একস্থানে বসে সদালোচনা করছিলেন। অকস্মাৎ তাঁরা পাকা কাঁঠালের গন্ধ পেলেন। তখন কাঁঠালের সময়ও নয় এবং কোথা থেকে গন্ধ আসছে কিছুই বুঝতে পারলেন না। সাধুটি কিছু সময়ের জন্য ধ্যানে বসলেন। তারপর ধ্যান ভঙ্গ হলে মৃদু হেসে ব্রাহ্মণকে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' অবশেষে তাঁরা গঙ্গায় নৌকা করে যেতে লাগলেন। অনেক পথ চলার পর তাঁরা এক গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগালেন। গঙ্গাতীরে দেখলেন, একটি লোক ঘাটে বসে তার বাবার শ্রাদ্ধ করছে এবং সেই শ্রাদ্ধে একটি পাকা কাঁঠাল দিয়েছে। তার বাবা কাঁঠাল ভালবাসতেন বলে অনেক কষ্টে এটি যোগাড় করেছে। যে লোকটি শ্রাদ্ধ করছিলো তাকে দেখিয়ে সাধুটি বললেন, ঐ লোকটিই তোমার পূর্বজন্মের পুত্র। সে তোমার উদ্দেশ্যেই এই শ্রাদ্ধ করছে। সেই জন্যই তুমি এই কাঁঠালের গন্ধ পেয়েছো।

গল্প শেষে মা বলছেন, এরূপও হয় বাবা। কিছুই আশ্চর্য নয়। এমন সময় কাজী সাহেব বললেন,—'মা, লড়াই ত শুরু হয়েছে। জয়ী যেন হতে পারি। মাঝে মাঝে রসদের বড় অভাব হয়। আপনি একটু দেখবেন।'

মা প্রত্যুত্তরে বললেন,—'যে ভগবানের দিকে যাবার জন্য লড়াই করে তার রসদ ভগবানই যোগান। সেজন্য ভাবনা করতে হয় না।'

মনের মত উত্তরটি পেয়ে কাজী সাহেব আনন্দিত হলেন আর বিস্মিত হলেন অন্যান্য ভক্তরা। এই নিরাভরণা সন্ন্যাসিনীর মুখে এত সুন্দর সুন্দর কথা যোগায় কে? আনন্দময়ী মা শুধু তপস্বিনী সন্ন্যাসিনী নন, কথাসম্রাজ্ঞীও বটে।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে লীলা করে শিলং-এর পথে যাত্রা করলেন। ফরেস্ট অফিসার ভক্ত মোহনলাল-বাবুর গাড়িতে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই মায়ের জন্য ব্যাকুল।

শিলং-এ মোহনলালবাবুর বাসায় তাঁবুতে শ্রীশ্রীমায়ের থাকবার ব্যবস্থা হলো। মায়ের আগমন সংবাদে দর্শনার্থীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো।

মেয়েদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী ঊষা ভট্টাচার্য মাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে নিয়ে গেলেন কলেজে। সেখানে অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের সাথে মা লীলা করতে লাগলেন। সকলেই ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

মা মৃদু মৃদু হাসলেন আর বললেন, 'তোমরা এই দিককার লেখাপড়া যেমন করছো, সেই দিকের লেখাপড়াও একটু করিও।'

'সর্বদা ঊর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে ঊর্ধ্ব পানে চল, নীচের দিকে লক্ষ্য রাখলে পাতালে নেমে পড়বে যে। দৃষ্টি সর্বদা ঊর্ধ্বে না থাকলেও অন্তত সমান সমানেও স্থির থাকতে তো পার। ঊর্ধ্বে উঠবার সাহস বা যোগের নামই উৎসাহ। দেহ চলছে কিন্তু মন চলছে না। আবার মন চলছে ত দেহ নড়ছে না। এরূপ অভিযোগ প্রয়াই শোনা যায়। তখন জোর করে ক্রিয়াশীল হতে হবে, নতুবা পতন অনিবার্য। সকল কাজে সাহস চাই। সাহসই শক্তি।

'এ সংসারে কেবল দেহ নিয়েই প্রবেশ করেছিলে, আবার এ ছেড়েই তোমাকে যেতে হবে। মাঝখানের এ সময়টুকুতে অতিরিক্ত আবরণ

বা আভরণের বোঝা বাড়ালে তা ছাড়তে বড় দুঃখ পেতে হবে। দেহ হাল্‌কা রাখ, মন হাল্‌কা থাকবে। এরূপে দেহ মন দুই হাল্‌কা হলে জীবাত্মার মুক্তি সহজ হবে।'//

মায়ের মুখনিঃসৃত উপদেশামৃত শ্রবণ করে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন সকলে। মা ফিরে এলেন তাঁবুতে। নামগান, কৃষ্ণকীর্তন শুরু হলো। শিলং পাহাড়ের অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কীর্তন খুব জমলো।

দেবদারু গাছগুলির পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপারে সূর্যদেব ধীরে ধীরে নেমে গেলেন। তখনও লাল রং-এর আভা ফুটে রয়েছে পাহাড়ের উপরের আকাশে। মায়ের আগমন উপলক্ষ্যে প্রকৃতিরাণী আজ অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছেন।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যা। ভক্তিমতী স্ত্রীরা মাকে সন্ধ্যা আরতি করলেন। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন শ্রীযুত সুধীর ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য মেয়েরা ফলাদি দিয়ে মাকে পূজা আরতি করলেন। মায়ের সান্নিধ্যে এসে সুধীরবাবুও মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়লেন।

অবশেষে ভক্ত সুগায়ক মতি মিঞা মাকে শোনালেন কালীর গান। মুসলমান হলেও ইনি এবং এঁর বংশপরম্পরায় সকলেই কালীভক্ত।

ভাবানন্দময়ী মা আনন্দময়ী গান শুনতে শুনতে ভাবস্থ হলেন এবং দিব্য জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে প্রতিভাত হলেন ভক্তগণের সম্মুখে। ভক্তরা মুগ্ধ হলেন।

এই ভাবে ভক্ত ও ভগবানের লীলা চললো দিনের পর দিন, শিলং পাহাড়ে। সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

অকস্মাৎ শ্রীশ্রীমা শিলং পরিত্যাগ করলেন। চেরাপুঞ্জি দর্শন করে কলকাতার পথে রওনা হলেন। পথে কার্সিয়াং ও দার্জিলিং-এ অবস্থান করে ভক্তসনে লীলা করলেন। মায়ের লীলারও শেষ

নেই, চলারও নেই বিরাম। পথের পর পথ পিছনে ফেলে মা সম্মুখ পানে ছুটে চলেছেন। মুক্ত বিহঙ্গমের মত লঘুপক্ষ বিস্তার করে তিনি দেশ হতে দেশান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছেন।···অনন্তের পথে···অসীমের সন্ধানে···।

আঠাশ

ত্রিবেণী।

গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী, তিন পুণ্যসলিলার যুক্ত বেণী যেখানে এসে আবার ত্রিধারায় মুক্ত হয়ে গিয়েছে সেই স্থানের নামই ত্রিবেণী। এলাহাবাদের ত্রিবেণী। কবিরা যাকে বলেন মুক্তবেণী। ত্রিস্রো বেণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিযুক্তা···। পুণ্যকামী শত শত স্নানার্থীর কোলাহল জাগে প্রতিদিন এই ত্রিবেণীরই ঘাটে। যুগ যুগ ধরে সাধক ও পুণ্যার্থী ভালবেসে এসেছে এই ত্রিবেণীর স্বচ্ছ রৌদ্রালোক আর গঙ্গাবারিকে। শত শত সাধকের পদরেণু-মিশ্রিত বালুকাসৈকত লক্ষ বছর ধরে এই মুক্তবেণীর কলরোল শুনছে। সেই বালুকা-সৈকতে মা আনন্দময়ী আজ আবার এসেছেন। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে। অনেকগুলি তাঁবু পড়েছে। অনেক সাধুসন্ত অনেক ভক্তের দল মাকে নিয়ে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে আছেন। এই ভাবে দিনের পর দিন মা ভক্তসনে লীলা করে চলেছেন। কখনও আবার সাধুসন্ত ও ভক্তের দল মাকে ঘিরে বসে বেদ ভাগবত ও চণ্ডী পাঠ করছেন।

শ্রীশ্রীহরিবাবা, মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীগোপাল ঠাকুর, স্বামী পরমানন্দ পান্নালালজী, গুরুপ্রিয়া দেবী, স্বামী শিবানন্দ, ভক্তপ্রবর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা আছেন।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে এলো। কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। মায়ের উপস্থিতিতে সকলেই যেন আনন্দসাগরে অবগাহন করে পরমানন্দ উপভোগ করছেন মনে মনে। মধ্যরাত্রির ত্রিবেণী তীর, নীরব নিস্তব্ধ চতুর্দিক, শুধু কানে ভেসে আসে জলরোলের শব্দ। শান্ত সমাহিত ধ্যানমৌন অনির্বচনীয় এক পরিবেশ।

সে রাত্রিরও আবার হলো অবসান। প্রভাতসূর্যের লাল আলো নৃত্য করতে শুরু করে দিলো ত্রিবেণীরই বুকে।

মা আজ ধ্যানগম্ভীর,—ভিন্ন এক মূর্তিতে হলেন প্রতিভাত ভক্তজনের সম্মুখে। সমস্ত দিনই এক তন্ময় ভাবে মগ্ন রইলেন। অনন্তের পথে···অসীমের চিন্তায়···নিমগ্ন। হঠাৎ মা কেন এমন হলেন, মা-ই জানেন মায়ের লীলারহস্য।

মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী শিষ্যবর্গসহ মেতে রইলেন কীর্তনানন্দে। কৃষ্ণকীর্তন। আনন্দকীর্তন। পুণ্যতোয়া ত্রিবেণীর বালুকাসৈকতে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর সুমিষ্ট কণ্ঠের ভাবপূর্ণ কীর্তন অনির্বচনীয় এক পরিবেশের সৃষ্টি করলো। শ্রীশ্রীমা তখনও ধ্যানস্থ।

ধীরে ধীরে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। মা তাঁর ছোট্ট তাঁবুতে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

হঠাৎ কি এক দুঃসংবাদে মুখর হয়ে উঠলো ভক্তবৃন্দের তাঁবু। মহাত্মা গান্ধী দেহত্যাগ করেছেন। নাথুরাম গডসের গুলিতে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। মৃত্যুসময় রামনাম উচ্চারণ করতে করতেই দেহসংবরণ করেছেন। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা।

সাধুসন্ত ভক্তের দল ছুটে এলেন মায়ের কাছে। স্বামী পরমানন্দ মাকে এই সংবাদ পরিবেশন করলেন। শ্রীশ্রীমা'র ধ্যানভঙ্গ হলো। ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যিশুখৃষ্টের মত।'

আবার বলছেন, 'দেখ, শ্রীকৃষ্ণ যে দেহরক্ষা করলেন, হিংসাকেও শ্রীচরণে স্থান দিয়ে দেহ ছাড়লেন। যিশুখৃষ্ট হিংসাকেও সর্বাঙ্গ দিয়ে আলিঙ্গন করে দেহ ছাড়লেন। হিংসাকেও হিংসা করলেন না।

গান্ধীজীও হিংসাবৃত্তিকে অহিংসাবৃত্তি দ্বারা জয় করলেন। শান্তভাবে রামনাম করতে করতে হাত জোড় করে পড়ে গেলেন।'

কথা শেষে মা আবার ভাবস্থ হলেন। ভাব-সমাধি।

প্রভাত-সূর্যের রঙীন আলোয় তখন ত্রিবেণীর আকাশ রক্তাভ। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। মায়ের ছোট্ট তাঁবু হতে বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে মাতৃকণ্ঠের দিব্যসঙ্গীত।···

গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল,
নন্দ দুলাল প্রেম গোপাল।

* * *

ত্রিবেণীর বালুকাসৈকত আবার মেতে উঠলো নামগানে। কৃষ্ণকীর্তনে। গান্ধীজীর মৃত্যু উপলক্ষে মা সমস্ত দিন উপবাসী রইলেন। সাধুদের ভাণ্ডারা হলো। অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ সে দৃশ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন। সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র জীবন-বেদ নিয়ে আলোচনা হলো। শ্রীশ্রীমাও আলোচনায় যোগ দিলেন। অবশেষে শুরু হলো ভাগবত পাঠ। ত্রিস্রোতা গঙ্গার জলকলরোলের সাথে ভাগবত পাঠকের সংস্কৃত শ্লোকের ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণ মিলিত হয়ে অপূর্ব মধুর শোনাতে লাগলো।

এই মধুর পবিত্র দিনগুলিরও হলো অবসান। মা আবার ত্রিবেণীর আনন্দের হাটকে পিছনে ফেলে দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন।

* * *

পথে মা বলছেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে। মা আনন্দময়ীর ভাষায়ঃ

'আজকাল কি রকম যেন হইয়া যাইতেছে। শরীরটাও যেন কি রকম। দেখিয়া শুনিয়া রাখিবার হইলে রাখিস্। চলাফেরাও কিন্তু কি রকম হইয়া যাইতেছে। আর কথা বলিতে বলিতে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কোনটার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতেছি না। দেখিতেছি অনেকেরই নাম মনে থাকিতেছে না—অথচ ইহারা পুরাতন লোক।

হয়তো একসময় বলিয়া বসিব, তোর নাম কি? এই রকমই হইয়া যাইতেছে।'

শ্রীশ্রীমায়ের গুরুগম্ভীর ভাব দেখে গুরুপ্রিয়া দেবী নীরব রইলেন।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ দিল্লীতে এসে পৌঁছুলেন। কিছুদিন ভক্তসনে লীলা করে শ্রীশ্রীহরিবাবার অনুরোধে মা আবার চলে এলেন বাঁধে। হরিবাবার আশ্রমে। শ্রীশ্রীউড়িয়াবাবাকেও বৃন্দাবন থেকে মোটর গাড়ি করে নিয়ে এলেন। উড়িয়াবাবা সর্বদাই পদব্রজে যাতায়াত করেন। গাড়ি চড়া তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। মা তাঁর সে নিয়ম ভঙ্গ করালেন। পরবর্তীকালে উড়িয়াবাবা 'আনন্দময়ী মা' সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মাইয়াকে আমি এতদিন বুঝিতে পারি নাই। আমার কাছে আসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছে। মাইয়ার ত্যাগের ভাব এবং সর্বাবস্থায় সর্বদা প্রসন্নতা দেখিয়া বড় ভাল লাগিয়াছে। মাইয়ার কাছে আমার কোন সঙ্কোচ নাই। মাইয়ার কাছ থেকেই আমি শক্তি পাই। সর্বদাই আমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁকে নিবেদন করে থাকি।'

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আগমনে বাঁধ আবার প্লাবিত হয়ে উঠলো। নামযজ্ঞ। কৃষ্ণকীর্তন। সৎসঙ্গ। মাও হরিবাবার সমস্ত প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে প্রোগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলছেন। মা সর্বদাই ভাবে বিভোর হয়ে আছেন। ঢুলু ঢুলু ভাব। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব। শ্রীশ্রীহরিবাবা, শ্রীশ্রীউড়িয়াবাবা, স্বামী শরণানন্দ চক্রপাণিজী, প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী ও মায়ের স্নেহধন্য চিত্ত (ভক্তপ্রবর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়) সকলেই মায়ের ঐ গদগদ ভাব নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

ভাবে গদগদ হয়ে মৃদু মৃদু হেসে শ্রীশ্রীমা বলছেন, ভগবানের এক নাম চিন্তামণি। তিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন বলে জীব তাঁকে চিন্তা করলে ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা থাকে না। এবং তাঁর ভাবে জীব অনুপ্রাণিত হয়ে যায়। অর্থকামীর অর্থচিন্তা বা পুত্রকামীর পুত্রচিন্তার মত তাঁর চিন্তাও খুব তীব্র হওয়া দরকার।

জীবনযাত্রার সকল চিন্তার ভিতর তাঁকে সর্বাগ্রে রেখে চলতে চলতে তাঁর প্রতি লক্ষ্য আসে। এরূপে যদি তাঁকে হৃদয়ের কেন্দ্রস্থানে বসানো যেতে পারে, তিনি সকল ভার নিয়ে সেবককে কেবল তাঁর চিন্তার জন্য মুক্ত করে রাখেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর ভিতর, ভোগী সংসারীর মধ্যে, এমন কি পশুপক্ষীতেও এরূপ কত উদাহরণ দেখবে। উদ্ভিদেরা পর্যন্তও তাঁর এই কৃপার অধিকারী। ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে দড়ি ধরে তাঁর শরণে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে বসে থাকো, বাতাস তাকে আপনার গতিতে চালিয়ে নেবে।

আবার বলছেন, বসে বসে অন্ধকারে কেবল হাতড়াচ্ছো। আলোর সন্ধান কর। আলোর সন্ধান কর। কেরোসিনের ল্যাম্পে বা বিদ্যুতের বাতিতে কতদিন আর আলো করে রাখতে পারবে? তেল ফুরিয়ে গেলে বা সুইচ খারাপ হয়ে গেলে বাতি নিবে যাবেই যাবে। এমন আলো দিয়ে সংসারটিকে আলোকিত কর যেটি আর কখনও নিব্‌বে না। সে আলো কি জানো? ভগবৎনিষ্ঠা। ভগবৎপ্রেম।

মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে ভক্তরা মুগ্ধ হলেন।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে লীলা করে আবার চলে এলেন কাশীতে। গুরপূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে। কাশীর আশ্রমে আবার বসে গেলো আনন্দের হাট। প্রশান্ত সন্ধ্যায় মা নিজ প্রকোষ্ঠে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। এমন সময় একজন ভক্ত গুরুপ্রিয়া দেবীকে একটি অভাবনীয় ঘটনার কাহিনী শোনালেন। ঘটনাটি ঘটেছিল মায়ের অনুপস্থিতিতে। কাশীরই আশ্রমে। ভক্তটি বলছেন,—মিঃ টমসনের এক গুরুভাই। মাদ্রাজী। নাম রাজ-গোপালজী। গুরুও মাদ্রাজী এবং বেদান্তবাদী (মিঃ টমসন শ্রীশ্রীমায়ের পুরানো ভক্ত)। একদিন রাজগোপালজী টমসনের সাথে কাশীর আশ্রমে এসেছেন। আশ্রমে মায়ের অর্ধশায়িত এক ফটো দেখে তিনি চমকে উঠলেন এবং খুব আগ্রহান্বিত ও বিচলিত হয়ে

টমসনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কার ফটো। টমসন সাহেব প্রত্যুত্তরে বললেন, আনন্দময়ী মা'র ফটো এবং ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞেস করায় রাজগোপালজী বললেন, 'আমি বেদান্তবাদী, কিন্তু আমার পিতা ছিলেন একজন তান্ত্রিক সাধক। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি তাঁর উপাস্য দেবীকে বিসর্জন দেবো বলে স্থির করেছিলাম। কারণ আমি ওসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিসর্জন দেবার উদ্দেশ্যে দেবীর মন্দিরে গিয়ে দেখি যে দেবী দাঁড়ানো অবস্থায় নাই। অর্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। তা দেখে আমার মনে হলোঃ দেবীর বোধ হয় যাবার ইচ্ছা নাই। তাই তিনি এইভাবে শুয়ে আছেন। এই মনে করে বিগ্রহকে আর বিসর্জন দিলাম না। কিন্তু সেইদিন দেবীর যে অর্ধশায়িত মূর্তি দেখেছিলাম, তা এই ফটোর সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। সেই জন্য এই ফটো দেখে আমি চমকে উঠেছি। আমার নিকট এ সমস্ত বড়ই আশ্চর্যজনক বলে মনে হচ্ছে।' পরদিন ফুল এনে মায়ের ফটোতে দিয়ে তৃপ্ত হলেন। এবং জীবন্ত মায়ের দর্শন না পেয়ে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

এ কাহিনী শুনে গুরুপ্রিয়া দেবীও অভিভূত হলেন এবং পরে মাকে জানালেন। মা শুনে কিছুই বললেন না, শুধু দেবদুর্লভ হাসি হাসলেন। মা-ই জানেন মায়ের কি রহস্য।

* * *

কংখলে (হরিদ্বার) বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক Melita Maschmann, মেলিটা ম্যাসমান, শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করে বলেছিলেন, 'আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন 'আমি'……বিহীনা মানবী।—মাতা গঙ্গা বা পিতা হিমালয় যেমন। তাঁর দিকে তাকালেই মনে হয় সৎ বা অসতের অতীতে অবস্থান করেন তিনি।'

* * *

ছাদের বাগানটির দূর প্রান্তে মাতাজী ধীর পদক্ষেপে আসা যাওয়া করছিলেন। সময় সময় দাঁড়িয়ে তিনি তাকাচ্ছিলেন আকাশের

দিকে। বৈকালিক মেঘমালা প্রতিফলিত হচ্ছিল তাঁর চোখে। আমার মধ্যে যে ভাবোদয় হচ্ছিল তখন, যুক্তিবদ্ধ চিন্তার সীমার বাইরে তা। মেঘপুঞ্জ, বনরাজি, হিমালয়ের পর্বত-প্রবাহ—সবই সেই দৃষ্টির অতলে তলিয়ে গেছে,—যেন ঐটিই তাদের আপন আবাস। বৃষ্টি জলের কাদা গোলায় চন্দ্রের প্রতিফলনকে ছোট্ট আর অস্পষ্ট দেখায়। মায়ের চোখ আকাশের ছবিকে ধরেছিল বুকে, সমুদ্র যেমন বুকে ধরে সেই প্রতিবিম্বকে—ধরে ভগিনীর মত—একই সৃষ্টি-উৎস থেকে যে উৎসারিত তারা।

মাতাজীকে দেখার সময় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সবচেয়ে অভিভূত আর হতবুদ্ধি হয়েছিলাম আমি এজন্য যে, আমার বিশ্ব পরিকল্পনার মধ্যে 'মা আনন্দময়ী রূপ একটি তথ্যকে কোথাও খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। একটা বৃক্ষকে যদি পায়ে হেঁটে এগোতে দেখি, তাকে যেমন আমরা খাপ খাওয়াতে পারবো না আমাদের ধারণার সঙ্গে, ভয় হবে বুঝি সমস্ত অভ্যস্ত নিয়মকে সে গুঁড়িয়ে দেবে ফুৎকারে—ঠিক তেমনই হয়েছিল আমার।'

*　　　　*　　　　*

রহস্যময়ী মা আনন্দময়ীর আকর্ষণ শক্তিও যে কত তীব্র তা লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে ডাঃ পান্নালাল মাকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা মা, তোমার প্রতি লোকের এই আকর্ষণ কেন?'

শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে মিষ্টি করে বললেন মা, 'তা বুঝি জান না?'

নিজের হাত পা মাথা চোখ ইত্যাদির প্রতি কি আকর্ষণ হয় না? পরে আরও সরল করে বললেন, 'ছোট্ট মেয়ের উপর কি আকর্ষণ হয় না?'

'এ শরীরটা যে সকলেরই ছোট্ট মেয়ে।' এবারে মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। মধুর মায়ের মধুর সে হাসি।

*　　　　*　　　　*

শ্রীশ্রীমা আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছেন কাশীর আশ্রমের একটি প্রকোষ্ঠে। মিস ব্ল্যাঙ্কা (মায়ের পুরানো ভক্ত), মায়ের পদতলে বসে একখানি পত্র পড়ে শোনাচ্ছেন।

পত্রখানি মিস ব্ল্যাঙ্কার কাছেই লেখা হয়েছে। লিখেছেন মিঃ হেনরী পেতিত। তিনি জাতিতে ফরাসী। আদ্দিস আবাবাতে মন্ত্রিবিভাগে কাজ করেন। ইনি কাশীর আশ্রমে মায়ের দর্শনলাভ করেন। মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সুযোগও পেয়েছেন এবং আশ্রমে একদিন প্রসাদও গ্রহণ করেন।

"মাত্র তুই সপ্তাহ হয় আমি আদ্দিস আবাবাতে এসে পৌঁছেছি। তোমাকে না বলে থাকতে পারছি না যে কাশী হতে বেশী দূরে থাকা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেদিন আমি মাকে প্রথম দেখি সেই দিনই আমার মধ্যে সব কিছু যেন উলটপালট হয়ে গিয়েছে এবং ঐ ভাব এখনও চলছে। পণ্ডিচেরী এবং জিবুতিতে আমার মধ্যে যে নৈরাশ্যের উদয় হয়েছিলো মা হতে বিচ্ছিন্ন হবার পর হতেই উহা যেন ভীষণভাবে দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমি আমার সমস্ত কামনা বাসনা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ফেলেছি। যাতে নিজেকে মায়ের হাতের যন্ত্র করে তুলতে পারি, তাই হলো এখন আমার একমাত্র কাম্য।

মায়ের এই প্রভাব যা বিচ্ছেদ ও দূরত্ব হেতু ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে তা আমার পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছে। কেন না উহার জন্য আমি নিজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আমার সারা-জীবনের ধারণা যেন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আমি ধনবান নই, তাই বলে আমি নিঃস্বও নই। কিন্তু আমার মনের এই অবস্থা যদি স্থায়ী হয় তাহলে মায়ের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা আছে তার ক্ষীণ নিদর্শন স্বরূপ এবং মায়ের চরণতলে বাস করবার একমাত্র আকাঙ্ক্ষায় আমি যে সরকারের উচ্চতম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছি তা সানন্দে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।

অনেকের কাছে এটা হাস্যকর এবং বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ কথা আমার গোপন করা উচিত নয় যে, যতই আমি মায়ের বিষয় চিন্তা করি,—ততই আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় আমি শিশুর মত ক্রন্দন করে উঠি। মাকে মনে মনে জিজ্ঞাসা না করে আমি কোন কাজে হস্তক্ষেপ করি না।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে শুধু তাঁর প্রদত্ত একটি শুষ্ক ফুলের মালা স্মৃতিচিহ্নরূপে সঙ্গে নিয়ে বিগত ১৯৪৮ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখে আমি যে ভাবে কাশী হতে চলে এসেছি তা মনে হলে আমার গভীর অনুশোচনা হয়।"

শ্রীশ্রীমা পত্রের মর্মার্থ বাংলায় শুনলেন, প্রত্যুত্তরে কিছুই বললেন না। মৃদু মৃদু হাসলেন। অন্যান্য ভক্তরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন।

মা আনন্দময়ীর সংস্পর্শে এসে দূরে চলে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ, 'মা ধরতে জানেন, ছাড়তে জানেন না।' মা যে জগজ্জননী। বিশ্বমাতা। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা। সন্তানকে কি মা ভুলতে পারেন?

মা বলেন, 'কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে ত আসা যাওয়া নেই। তখনও যা, এখনও তা।'

ঊনত্রিশ

দেরাদুনের রায়পুর আশ্রম।

শ্রীশ্রীমা আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছেন। রাত্রি গভীর হয়ে আসে। চতুর্দিক নীরব নিস্তব্ধ। মৃদু বাতাস বৃক্ষপত্রকে আলোড়িত করে বয়ে চলেছে।

চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আশ্রমের গৃহকোণ থেকে বাতাস

বয়ে নিয়ে আসে বিখ্যাত গায়ক ওঁকারনাথজীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ধীর সুগম্ভীর সুরের সঙ্গীত। সঙ্গীত নয়—সুমিষ্ট সুরধ্বনি। মাধো—মাধো—মাধো……। এই নামটি তিনি নানা সুরে গেয়ে শোনাচ্ছেন মা আনন্দময়ীকে। কি সে সুর! কি ভাব! অপরূপ ধ্বনি-সঙ্গীত। গভীর রাত্রির বাতাসে সে শব্দের অনুরণন জেগে ওঠে। মাতৃদুগ্ধের তরঙ্গের মত শ্রোতাদের অন্তরকে যেন স্নিগ্ধধারায় করে দেয় অভিষিক্ত। সহসা রাত্রি যেন আলোকময়ী হয়ে ওঠে। বাতাস মধুরতায় আর্দ্র হয়ে যায়। শ্রোতৃবৃন্দের মন থেকে পালিয়ে যায় জাগতিক চিন্তাধারা। ফুলের মত হেসে ওঠে অন্তর। সকলেই মুক্তির আনন্দে বিভোর হয়ে যায়। সুরের লহরী বয়ে নিয়ে চলে পবিত্র একটি নামকে মাধো… মাধো…মাধো।

পর্যায়ক্রমে তিনিটি ঘণ্টা মৃদু মধুর সুরে ঘোষণা করে চলে মাধবের নাম। মাধো—মাধো—মাধো। মাধবের আরাধনা। মাধবকে যেন বলছে,—

'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ,
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥'

এই ভাবে সমস্ত রাত্রি অতিক্রান্ত হলো। কেউ ক্লান্তিবোধ করলেন না।

মধুর রসের মহাসমুদ্রে অবগাহন করে সকলেই তৃপ্ত হলেন।

মা আনন্দময়ী মাধবের বিরহে শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীরাধিকার মূর্তি ধারণ করলেন। ভাবময়ী মায়ের সে ভাবও ছিল অতি মধুর। ওঁকারনাথজী ও ভক্তবৃন্দ মায়ের সেই বিরহিণী মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

সঙ্গীত শেষে মা বললেন, 'মাধো-মাধো নাম কত স্বাদিষ্ট। এত মধুর নামকে গান রস রূপে যেন সকলকে একেবারে বিলিয়ে দিলেন।'

ওঁকারনাথজীও অশ্রুসিক্ত হয়ে ভাবে গদগদ হয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

দুপুর গেলো, বৈকাল গেলো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মা ভক্তবৃন্দ-পরিবৃতা হয়ে বলছেন, 'তোমরা যে আনন্দময়ের সন্তান। নিরানন্দে থাকবে কেন? বড় মানুষের ছেলে কি কোনদিন গরীব বলে নিজের পরিচয় দিতে চায়? এমন কি তার পৈতৃক বিষয়-বিত্ত নষ্ট হলেও, সে বড় ঘরের ছেলে মনে করে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকে। আর তোমাদের সবকিছু অক্ষুণ্ণ থাকতে ফকির হয়ে দিনপাত করছো। শরীরের মেরুদণ্ড সোজা না রাখলে কি কোন কাজ হয়? ভয় উদ্বেগ হতাশা প্রভৃতিকে সব সময় দূরে সরিয়ে দেবে। যেখানে আনন্দ উৎসাহ উদ্যম সেখানেই মহাশক্তি বর্তমান। মানুষের শুভ চেষ্টার অন্তস্তলে ঈশ্বরকে দর্শন করতে শেখ। তাহলে স্থূল কর্মতত্ত্বের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে অগ্রসর হয়ে পরমানন্দ লাভ করতে পারবে।

যার মনের হুঁশ বা আত্মচিন্তা আছে তাকেই বলে মানুষ। মানুষ না হলে অতিমানব হওয়া যায় না। সমাজ ও নীতির অনুশাসনে চলতে চলতে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয়। তারপর পারমার্থিক ভাবাদি এসে যখন মানুষকে ভাবিত করে তখন সে মোহের সীমা অতিক্রম করে অতিমানুষ হয়ে পড়ে। মানুষ করে অভাব পূরণের চেষ্টা। আর অতিমানুষ করে স্বভাবের প্রতিষ্ঠা। মানুষের কর্ম মানুষকে অভাব থেকে স্ব-ভাবে জাগ্রত করে। আর অতিমানুষের কর্ম তাকে স্ব-ভাবে ত্যাগে ও প্রেমে পূর্ণ করে। তাই বলি সর্বাগ্রে মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর।

সর্বদা জলের স্রোতের মত একমুখী ও তরল হয়ে থাকতে পারলে কোন ময়লা তোমার ভিতরে আটকাবে না। পরের ময়লাও তোমার সংসর্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আগুন দাউ দাউ করে শিখা নিয়ে অনেক উপরে ওঠে বটে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সেখানে শিখা আপনার স্বরূপ বা অহঙ্কার বজায় রাখতে না পেরে বাষ্পাকারে

পরিণত হয়। কিন্তু জলের অবিরাম গতি এমন একটানা থাকে যে নদনদীগুলি কত গাছ পাথর ঠেলে হাজার হাজার ক্রোশ অবিরোধে অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পেঁাছে যায়। পরতত্ত্বের সন্ধান বা সম্মিলন লাভ করতে চাইলে নদীর মত তরল ও একলক্ষ্যে চলতে থাকো।'

মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে ভক্তরা মুগ্ধ হলেন

এই ভাবে শ্রীশ্রীমা দিনের পর দিন লীলা করে চললেন রায়পুর আশ্রমে।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন রায়পুর আশ্রমের শিব-মন্দির ও ধর্মশালার পূর্ব ইতিহাস।

আনন্দময়ী মা'র ভাষায়ঃ 'এই সব সম্পত্তি কৌশাম্বীলাল নামে একজন ব্রাহ্মণের ছিল। যখন জ্যোতিষ এবং ভোলানাথকে লইয়া ঢাকা হইতে বাহির হই তখন রায়পুরের এই জায়গাটা দেখিতে পাই। সেইজন্য এইস্থানে আসা। তোমরা এখন মন্দির ইত্যাদির যে অবস্থা দেখিতেছ তখন ইহার কিছুই ছিল না। তখন সবই ভাঙ্গাচুরা ছিল। আমরা তিনজনে আসিয়া ঐ ভাঙ্গা মন্দিরেই জায়গা লইলাম। ভোলানাথ শিব মন্দিরে সাধন করিত আর আমরা উপরের কোঠায় থাকিতাম। লোকে মনে করিত যে ভোলানাথই একজন বিশিষ্ট সাধু, সাধন ভজনের জন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে। আর আমি তাহার স্ত্রী, একা থাকিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছি। জ্যোতিষকে তাহারা আমাদের চাকর মনে করিত। কারণ জ্যোতিষ তখন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া থাকিত, যাহা তাহার হাঁটু পর্যন্তও পেঁাছিত না। কিছুদিন পরে যখন রায়পুর পোস্টাফিসে জ্যোতিষের নামে সরকারী চিঠি আসিতে লাগিল এবং তাহার নামের পিছনে আই. এস. ও. উপাধি দেখিতে লাগিল তখন তাহার সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলাইয়া গেল। ছোট জায়গা কিনা, গোপন থাকে না।

কৌশাম্বীলাল ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

তাই যখন এইসব মন্দির দান করিয়া ফেলার কথা উঠিল, নানা জনে নানা প্রস্তাব করিতে লাগিল। তখন ইহারা বলে যে, যদি দান করিতে হয় তবে এসব মাকেই দান করিব। শেষ পর্যন্ত তাহাই হইল।'

মা তাই রহস্য করে কৌশাম্বীলালের স্ত্রীকে বলছেন, 'আমার মালিকানী।'

অবশেষে মা এলেন ডুঙ্গাতে। ভক্তদের আহ্বানে। ডুঙ্গার জমিদার শের সিং শ্রীশ্রীমায়ের পরম ভক্ত। মায়ের সংস্পর্শে এসে শের সিং-এর জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এই শের সিং সম্বন্ধে মা বলেন, 'শের সিং আমার সহিত বেশী কথা বলে না। আমার নিকট হইতে দূরে দূরেই থাকে। অনেক সময় আমার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে। আগে সে ভয়ানক মাতাল ছিল। এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।'

চৌধুরী শের সিং ভাবে গদগদ হয়ে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। সরল গ্রাম্য মানুষেরা অনাড়ম্বর পরিচ্ছদে ভক্তিভাব নিয়ে ফল ও ফুল দিয়ে একে একে এসে মাকে প্রণাম করলেন। পূজা, আরতি, নামগান। জনপদের পথে পথে প্রচারিত হলো মায়ের আগমন সংবাদ। প্লাবিত হয়ে উঠলো ডুঙ্গা। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো ডুঙ্গার গ্রাম্য মানুষেরা।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা ডুঙ্গার ভক্তদের সঙ্গে লীলা করে আবার ফিরে এলেন দেরাদুনে।

অবশেষে চিরবাঞ্ছিত চিরস্মরণীয় দিনটি এসে পড়লো। অনির্বচনীয় আনন্দের অমৃতভাণ্ডার হাতে নিয়ে। জন্মদিবসের সেই দিনটি। ১৯শে বৈশাখ।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জন্মোৎসব। কিষণপুর আশ্রমে। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তের দল এসে মিলিত হলেন। হিমালয় থেকে এলেন সাধুসন্তের দল। পাঞ্জাবের খান্না থেকে এসেছেন শ্রীত্রিবেণীপুরীজী।

খুব উচ্চাবস্থার সাধু। শিশুর মত সরল। পরমহংস ভাব। কিন্তু মায়ের নামে পাগল।

সেবক চেতনপুরী বলছেন, 'মহারাজজী ফল ইত্যাদি খেতে চান না। কিন্তু যদি বলা হয় যে মাতাজী আপনাকে এই ফল পাঠিয়েছেন, তবে আর দ্বিরুক্তি না করে খেয়ে ফেলেন। কোথাও হয়তো যাওয়ার ইচ্ছা নাই, কিন্তু যেইমাত্র শুনলেন যে মাতাজী তাঁকে যেতে বলেছেন, অমনি বৃদ্ধ উঠে রওনা হলেন।'

ত্রিবেণীপুরীজী আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে বলছেন, 'মাকে কেহই চিনিতে পারে নাই। মায়ের কোন সঙ্কল্প বিকল্প নাই। তোমরা এখনও মাকে অবতার জ্ঞানে অবতারদের মধ্যে দেখিতেছ। মা আরও উচ্চে—আরও অনেক আগে।'

শ্রীশ্রীহরিবাবা, কৃষ্ণানন্দজী, চক্রপাণিজী, রামদেবানন্দজী, স্বামী শরণানন্দ, প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী, উত্তর কাশীর দেবীগিরি মহারাজ ও স্বামী শঙ্করানন্দও এসেছেন।

জন্মতিথিতে—

—ভাবে বিভোর হয়ে শ্রীশ্রীমাকে পূজা করছেন কুসুম ব্রহ্মচারী।

ফুলের সাজে সজ্জিত হয়ে মা অপরূপ এক দেবীমূর্তিতে হলেন প্রতিভাত ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। অনুপম তাঁর রূপ, স্নেহসিক্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি। ধূপে দীপে গন্ধপুষ্পে পূজিত হলেন জগজ্জননী। পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলো, শ্রীশ্রীমা হাত জোড় করে চিত্রার্পিতের মত বসে আছেন।

শুদ্ধাত্মা ভক্তরা মায়ের এই অনির্বচনীয় রূপ যতই দেখছেন ততই মুগ্ধ হচ্ছেন। মা যেন সুধাহ্রদে ডুব দিয়ে রয়েছেন।

মা বলেন, 'সেই অমৃতময় ঈশ্বরের ধ্যানেই সর্বদা প্রাণ মন পূর্ণ করে রাখো। তাঁকেই একমাত্র প্রয়োজন। আর সব অপ্রয়োজন।'

তাঁকে বিনা মানুষের চলে না, ছেড়ে চলবার জায়গা নেই। সেজন্য বাদ দেওয়া যায় না। বাদ হয় না।

ভেসে থাকা পর্যন্তই সাম্প্রদায়িক ও লৌকিক ভেদাভেদ। যে কোন উপায়ে ডুব দিতে পারলেই দেখা যায় পরমতত্ত্ব মাত্র এক, সত্য ভাবও এক।'

ত্রিশ

পরম পুণ্যধাম বারাণসী আশ্রম প্রণমি, নমো নমঃ যজ্ঞদেবতা,
পুণ্য-প্রবাহিনী বরুণা-অসি-ধারা মিলিত, চঞ্চল-চপল-তরঙ্গা,
সদামুক্ত মহেশ্বর দেবেশ বিরাজিত ; ধৌত চরণতল গঙ্গা।
(হেন) পরম পুণ্য-ভূমি মাঝে (শ্রী) আনন্দময়ী রাজে
নিখিল চরাচর মাতা ॥
নমো রাজেশ্বরী (শ্রী) আনন্দময়ী নমো নমঃ যজ্ঞদেবতা
নমঃ হে, নমঃ হে, নমঃ হে

* * *

প্রভাতী সুরে ভোরের বেলা ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত। পুণ্যসলিলা গঙ্গা-তীরের কাশীর আশ্রমে। পবিত্র সে সঙ্গীত। অপূর্ব সে সুর। শুদ্ধাত্মা ভক্তবৃন্দের প্রাণে প্রাণে জেগে উঠছে অনির্বচনীয় এক ভাবের শিহরণ।

মহামহোৎসবের আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে কাশীর আনন্দময়ী আশ্রম। ৩০শে পৌষ। ১৩৫৬ সন। আজ সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

ভক্তবৃন্দের সমাগমে আশ্রম পরিপূর্ণ। বোম্বাই গুজরাট মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব দিল্লী বিহার বঙ্গদেশ উড়িষ্যা মাদ্রাজ কোনও প্রান্ত থেকেই ভক্তরা বাদ যান নাই। রাজা মহারাজা হতে দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ সকলেই

এসে মিলিত হয়েছেন। এত লোকের যজ্ঞদর্শনে একত্র মিলন, সে এক অপূর্ব ব্যাপার। আনন্দের হাট বসে গেছে। সকলের মুখেই এক কথা, 'কি ভাবে যে আশা সম্ভব হয়েছে তা আমিই জানি না।'

নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মারা। বৃন্দাবন থেকে শ্রীশ্রীহরিবাবা ও স্বামী অখণ্ডানন্দ খান্না থেকে ত্রিবেণীপুরীজী, উত্তর কাশীর দেবীগিরিজী, বম্বের কৃষ্ণানন্দজী, পাঞ্জাবের অবধূতজী, বৃন্দাবনের চক্রপাণিজী, ঝুঁসীর প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী এবং অন্ধ সাধু স্বামী শরণানন্দজী ও আরও অন্যান্যরা। অসংখ্য সাধু মহাত্মা ও ভক্তের সমাগম হয়েছে। অশীতিপর বৃদ্ধ দেবীগিরিজী হাসতে হাসতে বলছেন —'আমার ত আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মাতাজী আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন। ইহা সব মাতাজীর লীলা।' সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধরে চলে এই যজ্ঞলীলা। আজ পূর্ণাহুতি। ভোর হতেই যজ্ঞোৎসবের সানাই বেজে ওঠে। প্রভাতী সুরের রাগরাগিণী অর্ধসুপ্ত ভক্তবৃন্দের কর্ণকুহরে ঝলকে ঝলকে অমৃতধারা বর্ষণ করে চলে। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীদের মিলিত কণ্ঠের এই মধুর সঙ্গীত শুরু হয়। সঙ্গীতশেষে ব্রহ্মচারীরা গঙ্গাস্নান করে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করতে থাকেন। কি সুন্দর সে উচ্চারণ! কি অপূর্ব পবিত্রতাময় সে ধ্বনি!

প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস সাবিত্রীমন্ত্রপুটিত হব্যবাহী ঐ যজ্ঞধূমকে পুণ্যতোয়া গঙ্গার উপর দিয়ে প্রবাহিত করে চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলকে করে তোলে পবিত্র।

সমস্ত আশ্রমটির মধ্য দিয়ে এক সাত্ত্বিক ভাবের প্রবাহ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আশ্রমটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ফুলে মালায় সজ্জিত হয়ে এক অপরূপ শোভা ধারণ করে আছে। যজ্ঞশালার উপর শাস্ত্রীয় বিধান মত নানা বর্ণের নানা রূপের নানা আকারের সব ধ্বজা পতাকা শোভা পাচ্ছে। যজ্ঞশালার চতুর্দিকে মহাত্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীরা মায়ের দেওয়া নূতন নামাবলী গায়ে দিয়ে যজ্ঞের নানা কর্মে ব্যাপৃত।

আচার্যদেব শ্রীঅগ্নিসত্ত্ব শাস্ত্রী বলছেন, 'মা প্রতিটি বিষয় এমন শাস্ত্রোক্ত ভাবে করিয়েছেন যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমাদের অনেক সময়ই অনেক কিছু ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু মা তা নিজে খেয়াল করে পূর্ণ করেছেন। মা যে স্বয়ং পূর্ণ হয়ে বসে আছেন।'

যথাসময়ে যথামত বেদধ্বনির সঙ্গে পূর্ণাহুতি হয়ে গেলো। এই সময় অগ্নিদেব যখন লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে উর্ধ্ব দিকে ধাবিত হলেন তখনই শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে ঐ শিখা হতে নূতন অগ্নি আহরণ করে রাখা হলো। এবং পরে আশ্রমের ছাদের উপর নূতন যজ্ঞমন্দিরে উহা বিধিপূর্বক স্থাপন করা হলো।

পূর্ণাহুতির সময় গুরুপ্রিয়া দেবী যজ্ঞকুণ্ডে অলৌকিক দর্শন করে বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। শ্রীশ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর ভাষায়ঃ

"পূর্ণাহুতির দিন সজল নয়নে অগ্নিদেবকে বলিলাম, তুমিও যে মাও সে। আমি ত জপের সংখ্যা রাখিতে পারিলাম না। যতক্ষণ পূর্ণাহুতি শেষ না হয় ততক্ষণ আমি জপ করিব। তুমি উহা গ্রহণ কর এবং আমাকে দেখা দাও। তারপর জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সাধ্য কি যে স্থির ভাবে জপ করিব। কিছুক্ষণ পরেই অন্যমনস্ক হইয়া সব ভুলিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু অগ্নিদেবের দিকে চাহিয়া দেখি কি, অগ্নিদেব যজ্ঞশালা ভেদ করিয়া আকাশে মিশিতে চলিয়াছেন। অগ্নিশিখা যজ্ঞশালার চূড়ার প্রধান ধ্বজদণ্ডের পাদদেশ স্পর্শ করিয়া যেন উর্ধ্ব দিকে উঠিতে লাগিল। ঐ দৃশ্য দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। আমি যেন আর আমাতে নাই, সব কিছু ভুলিয়া বসিয়া আছি। চারিদিকে যেন কোথাও কিছু নাই, শুধু লেলিহান অগ্নিশিখা। অকস্মাৎ নয়নগোচর হইল একটি রক্তবর্ণ মূর্তি যজ্ঞকুণ্ড হইতে উঠিয়া উর্ধ্বে মিলিয়া গেল। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিহ্বল ভাবে মা—মা করিতে লাগিলাম। পরমুহূর্তেই দেখি আমার মা

আনন্দময়ীও ঐ ভাবে উঠিয়া শূন্যে মিলিয়া গেলেন। মা যে মূর্তিতে আমার পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন ঠিক সেই. মূর্তিতেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে উঠিলেন দেখিলাম। আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি স্তব্ধ ও আবিভূ'ত হইয়া গেলাম। এত স্পষ্ট সে মূর্তি যে অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ দেখি না। তখনও হৃদয়ের স্পদন থামে নাই। মন হইতে প্রশ্ন উঠিল তবে এই 'আনন্দময়ী মা' কে? ইনিই কি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর? পরমেশ্বর? মানবী রূপে যাঁকে সর্বদা দেখিতেছি, ইনিই কি স্বয়ং দেবী ভগবতী? উত্তর মিলিল না। ভাবে বিভোর হইয়া রহিলাম। ইহা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কৃপা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

ইতিপূর্বে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও অলৌকিক দর্শন করেন। তিনি যজ্ঞারম্ভের প্রথম দিনে সুদীর্ঘ তিন মাস যজ্ঞের ব্রহ্মা ছিলেন। তখন একদিন অকস্মাৎ নয়নগোচর করেন—একটা জ্যোতিঃ শ্রীশ্রীমায়ের দেহ হতে বহির্গত হয়ে শ্রীশ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর দেহে প্রবেশ করছে। জ্যোতিঃ দর্শন করে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন।

এই মহাযজ্ঞের ফল সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করা হলে মা বললেন, 'অগ্নিদেব যে এইভাবে প্রকাশিত হয়ে এতদিন পর্যন্ত সেবা নিচ্ছে তা কি সবই একেবারে অর্থশূন্য? ঐ যে অগ্নিকে এক মহাযজ্ঞে লাগিয়ে দেওয়া হবে বলে একটা কথা এই শরীরের মুখ হতে বের হয়েছিল তা কি শুধু কথার কথা? নিশ্চয় জেনো যা কিছু হচ্ছে সব কিছু তাঁর রাজ্যের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট অসৃষ্ট সমগ্র নিয়েই কোন ব্যাপার। যা কিছু তিনি এইভাবে করিয়ে নিচ্ছেন তাকে ছেলে-খেলা মনে করো না। তিনিই এইরূপে প্রকাশ হয়ে যখন যা দরকার তা আপনা-আপনিই সব করিয়ে নিচ্ছেন।'

এইভাবে শ্রীশ্রীমা কাশীর যজ্ঞলীলা সমাপন করে চলে এলেন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে।

* * *

'ডাকতে চাই ডাকতে পারি না'—একথা বললেই কি হল? বাড়িতে সামান্য যদি অসুখ-বিসুখ করে, সময়ে অসময়ে ডাক্তার কবিরাজের কাছে কত ছুটাছুটি কর। সংসারের কোন কাজে যদি সামান্য ওলটপালট হয় অমনি শৃঙ্খলার কত বিধি-বিধান করো, আর যেই ঈশ্বর-চিন্তার পালা আসলো তখন 'পারি না' বলেই তাঁর কৃপার দোহাই দিয়ে একেবারে সরে রইলে। একি কর্মীর কথা? একবার উৎসাহের সঙ্গে জেগে ওঠ, খুব ডাকতে পারবে। নিজের শরীরটা সুস্থ, সুন্দর সুঠাম করবার জন্য যেমন ভাবে যত্ন করো, তেমন ভাবে মনটাকেও তৈরী করবার ব্যবস্থা করো। দেখবে ডাকবার ভাবটি প্রাণে আসবেই আসবে। কেবল তত্ত্ব নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, তদনুযায়ী কর্ম ও অভ্যাস চাই। একলক্ষ্যে কর্ম করতে করতে কর্মসিদ্ধির কৌশল আপনা হতে জানা হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দ-পরিবৃতা হয়ে বলছেন। বহরমপুরে। বহরমপুরের ভক্তরা দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাকে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে গৌরাঙ্গ মা ও অবনী শর্মাও আছেন। গৌরাঙ্গ মা কলকাতায় লেডি গৌরাঙ্গ বলে ভক্ত-সমাজে পরিচিতা। এঁর ইউরোপীয়ান ভক্তও আছেন। সর্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। ব্রজভাষায় কথা বলেন, মধুমাখা সে কণ্ঠস্বর। রূপও তাঁর পার্থিব নয়, এ যেন শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময় তৃষ্ণার ঘনীভূত উজ্জ্বল বিগ্রহ। আনন্দময়ী মা ও গৌরাঙ্গ মা'র উপস্থিতিতে সমস্ত বহরমপুর শহর প্লাবিত হয়ে উঠলো।

কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও মহারাণী নীলিমা দেবী মাকে অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সেখানেও মাকে ফল ফুল দিয়ে পূজা ও আরতি করলেন। বহরমপুরের বিভিন্ন স্থানে লীলা করে, কলকাতা ও ডায়মণ্ডহারবার হয়ে মা এসে পেঁছুলেন মেদিনীপুরের বরদা গ্রামে। স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা বিশেষ প্রার্থনা করে মাকে নিয়ে এসেছেন। মাকে ঘিরে

তাঁরা নাম-যজ্ঞে মেতে উঠলেন। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো ছোট্ট বরদা গ্রাম। দিবারাত্র আনন্দ কীর্তন। কৃষ্ণ গুণগান। কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে রইলো সকলে। আবার সেই শুভ দিনটিরও হলো অবসান। মা আবার বের হয়ে পড়লেন আপন পথে। পথের পর পথ পিছনে ফেলে মা আবার সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। লীলাময়ী মা আনন্দময়ীর লীলার নেই শেষ। মা আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতার আশ্রমে তখন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। মাকে পেয়ে ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। মা যে আনন্দদায়িনী আনন্দময়ী।

রামবাবা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু। আনন্দময়ী মা সম্বন্ধে ভক্তদের বলতেন, 'ওরে ওখানে আগুন জ্বলে রে। গেলেই শুদ্ধ হয়ে আসতে পারবি।'

আশ্রমে ভক্তরা মাকে ঘিরে বসে মায়ের উপদেশামৃত শ্রবণ করছেন।

শ্রীশ্রীমা হেসে হেসে বলছেন, 'কন্যাকুমারীর সমুদ্র-কূলে দাঁড়ালে দেখা যায় যে ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠছে ও ভাঙছে এবং ভেঙে কোন্ অনন্তে যে মিশে যাচ্ছে তার নিরাকরণ নেই। এই জগৎটিও মহাসমুদ্র বিশেষ। কত বস্তুর পলে পলে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে যাচ্ছে এবং বিনাশ হয়ে কোথায় যে যাচ্ছে তা মানববুদ্ধির অগম্য। প্রকৃতির এই অবিরাম গতি বেশ ঝুঝিয়ে দেয় যে, জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই এবং এক পরমপুরুষই নানাভাবে নানারূপে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করছেন মাত্র। প্রকৃতির বিধানগুলি সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শেখ। তার নিরপেক্ষ ভাব হৃদয়ঙ্গম কর, তা হলে যিনি সকল কারণের বিধাতা তাঁর চিন্তা আপনা হতে জাগ্রত হয়ে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই প্রমাণ করে দেবে।

জিহ্বাতে স্বাভাবিক রস আছে, কিন্তু যে পর্যন্ত তিতো মিঠা কোন জিনিসের সংস্পর্শে এসে না পড়ে ততক্ষণ নীরসই থাকে। আবার

আরও চমৎকার দেখ, কটু কষায় এর উপর যখন যা দেবে সেই রসে এ হবে রসবান। সেই রকম এই যে দেহখানা দেখছো এতে নেই এমন কিছুই নেই। একে একটি ব্রহ্মাণ্ড বললেও চলে। যখন যে ভাবে একে রাখতে চাও, সে ভাবেই এ থাকবে। সংসারভাব চাও, দেখবে কেমন করে তোমাকে হয়রান করে ছাড়বে। আর ধর্মভাবে একে ভাবিত কর, দেখবে, তোমাকে শান্ত ও অটল করে দেবে। দেহের মূল্য আছেও, নেইও। দেখো না যতক্ষণ নদীর এপারে রয়েছো ততক্ষণই ওপারে যাবার জন্য নৌকার উপর মায়া থাকে। যেই ওপারে যাওয়া গেল, আর নৌকার কথাই মনে আসে না। দেহের সার্থকতাও তদ্রূপ। যখন আমিত্ব লোপ হয়ে যাবে, তখন জগতের সঙ্গে সঙ্গে দেহও দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকবে।

মাতার পরিচয় যেমন স্নেহমমতায়, পত্নীর পরিচয় যেমন প্রেম ও অনুরাগে, বন্ধুর পরিচয় যেমন প্রীতি ও আত্মীয়তায়, তেমনি ধার্মিকের পরিচয়ও ধর্মাচরণে। 'ধর্ম মানি'—কেবল এ কথাতে কোন লাভ নেই। ভাবে ও কাজে ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। ব্রত উপবাস জাগরণ বা তদ্রূপ ক্লেশকর সাধনের দ্বারা কর্মের উপর ভর করে চললে অথচ ভাবের অভাব, তাতে শুধু কর্মসংখ্যারই পূরণ করা হয়। ভিতরে নিজেকে ভাল করে দেখ, যেখানে যে খুঁত দেখতে পাও সেগুলি সারাবার চেষ্টা কর। এরূপে যে স্তরে আছো তদুপযোগী কাজ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। তাহলে সময়ে কর্ম ও ভাব সংযুক্ত হলে প্রকৃত ধর্মলাভে সমর্থ হবে।

কলকাতার ভক্তরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে শুনলেন মায়ের অমৃত-নিষ্যন্দিনী সুরের বাণী।

মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে ভক্তপ্রবর ব্যারিস্টার শ্রীযুত অনিল গঙ্গোপাধ্যায় বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে বললেন কাব্যায়িত করে, আকাশের সূর্য এবং কাগজে আঁকা সূর্যের মধ্যে যে পার্থক্য মায়ের মুখের কথা এবং পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেও সেই পার্থক্য। মায়ের

এক একটি বাণীর অন্তরালে যে এক একটি চিত্র ভেসে ওঠে তা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, তুলি দিয়েও নয়।' শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মনোরমা দেবী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। মায়ের নামে পাগল।

অবশেষে শ্রীশ্রীমা কলকাতার লীলা সাঙ্গ করে চলে এলেন জামসেদপুর টাটানগরে। এখানে ভক্তরা অনেকদিন মায়ের দর্শন না পেয়ে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলেন। জামসেদপুর থেকে মা এলেন পুরীধামে। ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বরে দর্শন করলেন, ভুবনের অধিপতি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেবকে। শ্রীশ্রীলিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরকে। বিশাল মন্দির কিন্তু বিরাটের অহঙ্কার নেই। এমনই অপূর্ব শিল্পকলা। শিল্পীর সফল সাধনার সম্ভার ভুবনদেবরঞ্জন হয়ে উঠেছে। ভুবনেশ্বর পুরীধাম থেকে শ্রীশ্রীমা আবার ফিরে এলেন কাশীতে। বারাণসীধামে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ পারিজা মাকে বিশেষ অনুরোধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এলেন। বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসবে। প্রথম দিন যাগযজ্ঞাদি করা হয়। সেই উপলক্ষেই মাকে নেওয়া। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর পুত্র গোবিন্দ মালব্যজী পূর্ণাহুতির সময় শ্রীশ্রীমাকে বিশেষ অনুরোধ করে মাকে দিয়ে আহুতির দ্রব্যসম্ভার একটু স্পর্শ করালেন। পণ্ডিতগণ স্তোত্রাদি পাঠ করলেন; মা'র হাত দিয়ে প্রসাদ বিতরণও করা হলো। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে নূতন প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে মাকে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর সভামণ্ডপে পদধূলি দিয়ে মা আবার ফিরে এলেন আশ্রমে।

আশ্রমে এসে নাম-গানে বিভোর হয়ে রইলেন। মা তন্ময় হয়ে গাইতে লাগলেন, 'গুরু গোবিন্দ ব্রহ্ম নাম,—মা দুর্গা শিব রাম। গুরু গোবিন্দ ব্রজ ধাম, মা দুর্গা শিব রাম।'

লীলাময়ী মায়ের কাশীর লীলাও বেশীদিনের নয়। দু'দিন না

যেতেই যেন অস্থির হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশের টানে ছুটে বের হয়ে পড়লেন।

অকস্মাৎ মা চলে এলেন ভাগলপুর। ভাগলপুরে এসে দর্শন করলেন গৈবীনাথ শিবকে। গঙ্গার ঠিক মাঝখানে দ্বীপের মত একটি স্থান। সেখানেই শিবমন্দির। মা ভক্তবৃন্দসহ নৌকা করে গেলেন। মনোরম স্থান। প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতীব সুন্দর।

ভাগলপুর থেকে এলেন হাজারিবাগে। ভক্তেরা একটি নূতন বাড়িতে মায়ের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। মা সেইখানেই অবস্থান করলেন। দলে দলে ভক্তেরা এসে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে আর চরণধূলি মাথায় নিয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে লাগলেন। অভাবনীয় সে দৃশ্য।

এখানেও বেশীদিন নয়। মাত্র চার দিন মা অবস্থান করলেন হাজারীবাগে। আবার যাত্রা হলো শুরু।

কুলু ভ্যালী, জ্বালামুখী, উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বোম্বে আমেদাবাদ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে মা প্রচার করতে লাগলেন কৃষ্ণ নাম, রাম নাম, হরি নাম। সকলকেই মা বলেন, 'হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। যাহা রাম উঁহা অবিরাম, যাঁহা নহী রাম উঁহাহী বে-আরাম, ব্যারাম।'

এইভাবে বহু দেশ বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে শ্রীশ্রীমা আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে শুনলেন দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন অসুস্থ। পি-জি হাসপাতালে।

শ্রীশ্রীমা দ্বিধা না করে হাসপাতালে চলে এলেন। মুক্তিবাবাও তখন হাসপাতালে ছিলেন। মুক্তিবাবাকে দর্শন দিয়ে, ডঃ রাধাকৃষ্ণনের কামরায় এলেন। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, তাই শ্রীশ্রীমা তাঁকে স্পর্শ করে চলে এলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের জ্ঞান ফিরলে বিস্তারিত বলা হলে, তিনি মায়ের আগমন সংবাদে খুবই আনন্দ প্রকাশ

করলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণনই আনন্দময়ী মাকে প্রথম দর্শন করে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের ইনিই একমাত্র জীবন্ত সন্ন্যাসিনী।'

অবশেষে ধীরে ধীরে ডঃ রাধাকৃষ্ণন সুস্থ হয়ে উঠলেন। মায়ের লীলা মা-ই জানেন। কখন কাকে কি ভাবে দর্শন দিয়ে কি বিপদ কাটিয়ে দেন। মা যে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। পরমৈশ্বর্যদায়িনী কল্পলতা-রূপিণী। জগজ্জননী। তাঁরই পদচ্ছায়ায় ভারত তার ব্রহ্মজ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে একদিন সমস্ত বিশ্বকে মোহিত করে দেবে। বিশ্বের ঘরে ঘরে শান্তিবাণী পৌঁছে দেবে। ভারতের যিনি অধিষ্ঠাত্রী তিনিই বিশ্বজননী। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা।

মা বলেন, 'কৃপা ত তিনি সর্বদাই করছেন। শুধু বুঝবার অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়।'

একত্রিশ

শীতের সুন্দর প্রভাত।

আকাশে নির্মল নীলিমা। পাখীদের কলকাকলি। সোনালী আলো চোখের উপর যেন সুধাবর্ষণ করছে। পথের দুই ধারে গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। অপূর্ব সে প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আনন্দময়ী মা ভক্তবৃন্দসহ চলেছেন পণ্ডিচেরীতে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরাদি দর্শন করে মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরীর পথে যাত্রা করলেন। অবশেষে সকাল ৯টায় ভক্তবৃন্দসহ মা এসে পৌঁছুলেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। উঠলেন এসে অতিথিশালায়। সমুদ্রের ধারে, মনোরম পরিবেশ।

মা প্রথমে দর্শন করলেন শ্রীঅরবিন্দের সমাধি। সুন্দর স্থানটি। সমাধির উপর ফুল দিয়ে সাজানো। সমাধিটি একটি গাছের নীচে

এমনভাবে স্থিত যে মনে হয় যেন বাসুকি শতফণা বিস্তার করে কৃষ্ণকে ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র থেকে করছেন রক্ষা। সমাধি স্থানে এসে মায়ের ভাব হলো। অপ্রাকৃত ভাবে বিভোর হলেন ব্রহ্মানন্দময়ী মা আনন্দময়ী।

অবশেষে মায়ের পুরানো ভক্ত শ্রীযুত চারুপদ ভট্টাচার্য আনন্দময়ী মাকে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে নিয়ে এলেন। শ্রীঅরবিন্দ যেখানে বসতেন সেই ঘরে পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখা গেল Mother দাঁড়িয়ে আছেন। আনন্দময়ী মা ধীরে ধীরে নিকটে গেলেন। Mother-এর সঙ্গে আনন্দময়ী মায়ের দৃষ্টিবিনিময় হলো। উভয়ে উভয়ের প্রতি কিছু সময় একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। জ্যোতির্ময়ী দুই দেবীমূর্তির সুন্দর দুই জোড়া চোখের মিলন হলো। সে-দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা কি দেখলেন তাঁরাই জানেন। কিছুক্ষণ পর Mother দুই চক্ষু অবনমিত করলেন।

অবশেষে Mother একটি গোলাপ ফুল, একটি বেল ফুল, দু'টি চকোলেটসহ আনন্দময়ী মা'র হাতে দিলেন। মা গোলাপ ফুলটি আবার তাঁর হাতে দিলেন। সঙ্গে একটি চকোলেটও দিলেন। Mother চকোলেটটি নিজে রেখে গোলাপটি পুনরায় মা আনন্দময়ীকে ফিরিয়ে দিলেন। এইভাবে দুই-তিন বার ফুলের আদান-প্রদান হলো। অবশেষে Mother একটু ফুল ছিঁড়ে রেখে বাকীটা আনন্দময়ী মা'র হাতে দিলেন। Mother এবং আনন্দময়ী মা'র ফুলের এই আদান-প্রদানের পিছনে কি রহস্য আছে তা তাঁরাই জানেন।

Mother ভক্তবৃন্দসহ আনন্দময়ী মাকে আদর আপ্যায়ন নিখুঁত ভাবেই করলেন। কোন রকম ত্রুটি হলো না। আশ্রমটিও নিখুঁত ভাবে নিয়মমাফিক পরিচালিত। সর্বত্রই সুশৃঙ্খল। শ্রীঅরবিন্দ নাই কিন্তু তাঁর ইচ্ছাকে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন এবং করছেন এই Mother। ইতিমধ্যে শ্রীযুত দিলীপ রায় ও শিষ্যা ইন্দিরা দেবী বিশেষ ভাবে প্রার্থনা জানিয়ে মাকে নিয়ে এলেন তাঁদের গৃহে।

শ্রীযুত দিলীপ রায় এখন আশ্রমবাসী। তারপর শুরু হলো দিলীপ রায়ের কণ্ঠের ভজন। মীরার ভজন। অপূর্ব সুমধুর ভাবপূর্ণ সে সঙ্গীত। মধুর সে দিব্য সঙ্গীত অন্তর হতে উত্থিত হয়ে অনন্তাভিমুখে কৃষ্ণসমীপে কোথায় যেন ভেসে চলেছে।···কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর সুর শুনে শুদ্ধাত্মা ভক্তরা পরমানন্দের আভাস পাচ্ছেন প্রাণে প্রাণে। সুরধ্বনি নয়, এ যেন দেবতার আহ্বান।

এইভাবে আনন্দময়ী মা শ্রীশ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে লীলা করে একদিন অবস্থান করে আবার বের হয়ে পড়লেন আপন পথে। ভক্তবৃন্দসহ আবার যাত্রা হলো শুরু। দেশ হতে দেশান্তরে। পথে পথে······ মন্দিরে···মন্দিরে···।

দাক্ষিণাত্যে মা পূর্বেও এসেছেন কিন্তু এবারে তীর্থযাত্রাপথের প্রধান সাথী হলেন শ্রীশ্রীহরিবাবা ও অবধূতজী।

পণ্ডিচেরী থেকে মা এলেন চিদাম্বরম্। দাক্ষিণাত্যে শিবের পঞ্চভূতের মূর্তি আছে। শিবকাঞ্চিতে ক্ষিতি মূর্তি। জম্বুকেশ্বরে অপ্ মূর্তি। অরুণাচলে তেজঃ মূর্তি। কালহস্তিতে মরুৎ মূর্তি। এবং চিদাম্বরমে ব্যোম মূর্তি। জ্ঞানাকাশে শিব লীন হয়েছিলেন, তাই তো এ স্থানের নাম চিদাম্বরম্। চিৎ মানে জ্ঞান এবং অম্বর অর্থাৎ আকাশ। প্রবাদ আছে শিব তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে ব্যোমে লীন হয়ে যান। তাই শিবকে বলা হয় ব্যোম মূর্তি। মূর্তিটি অতি সুন্দর এবং বৃহৎ। সম্পূর্ণ ছাদটি স্বর্ণময়। ইহা কনক সভা নামে প্রসিদ্ধ। আবার এই মন্দিরের পার্শ্বেই অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুমূর্তি। মা ভক্তবৃন্দসহ দর্শন করে আনন্দিত এবং তৃপ্ত হলেন।

চিদাম্বরম্ থেকে শ্রীশ্রীমা এলেন অরুণাচলে। মহর্ষি রমণের আশ্রমে। ভক্ত মিসেস তালায়ারখান পূর্বেই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। ইনি পার্শী মহিলা। মহর্ষির শিষ্যা। মা আনন্দময়ীর ভক্ত।

অরুণাচল পাহাড়ের নীচেই এই আশ্রম। বেশ শান্ত নীরব। মা

দর্শন করলেন মহর্ষির সমাধিস্থান। তপস্যার স্থান এবং সেই ঘরটি যে ঘরে তিনি একাদিক্রমে ২২ বৎসর বাস করে গেছেন এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

অবশেষে মহর্ষির ভাই নিরঞ্জন স্বামী শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন এবং সমাধির উপরে একটি হলঘর নির্মাণের জন্য মায়ের হাত দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করালেন। পূজা এবং বেদধ্বনির মধ্যে দিয়ে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হলো। পবিত্র আনন্দময় সে পরিবেশ।

আশ্রমের একজন সাধু ভাবে গদগদ হয়ে বলছেন, '"ভগবান" (মহর্ষি রমণ) নাই কিন্তু আনমন্দয়ী মা'র মধ্যে তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তার অনেক সামঞ্জস্য দেখিতেছি।'

শ্রীশ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী বলছেন, 'মনে হচ্ছে মা'র আশ্রমেই আছি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই মা সাধু মহাত্মা ও আশ্রমবাসীদের সঙ্গে এমন সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছেন বোধগম্যই হয় না যে অন্য আশ্রমে আছি। কোথাও ঈর্ষা বা অপ্রীতির স্থানই নাই। মায়ের ভাবেরও বিরাম নাই। যখন যে স্থানে থাকেন সেই স্থানের ভাবেই বিভোর হয়ে যান।'

সৎসঙ্গের ব্যবস্থা হয়েছে। সকলের একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীমা বলছেন, 'ডাক মাত্র একটি।' সে ডাকটির জন্যই নানা জাতির ভিতর নানা ব্যবস্থা রয়েছে। যেদিন কারো সে ডাকটি আসে সেদিন আর তার ডাকাডাকি থাকে না। যেরূপ নিশির নিস্তব্ধতায় দেবমন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি স্পষ্টরূপে শোনা যায় সেরূপ তাঁর প্রতি অনন্য ভাব-ভক্তির দ্বারা বিষয়-বিক্ষুব্ধতা শান্ত হলে সে ডাকের প্রতিধ্বনি এসে পূর্ণরূপে প্রাণে বাজে। তখনই খাঁটি ডাকটি বের হয়। ইহা সকলেরই আসবে, কেননা শিব যেমন জীবে পরিণত হয়েছেন, জীবও আবার শিবে পরিণত হবেন। জল ও বরফের মত জীব ও শিবের এই খেলাটি নিত্যকাল চলছে।'

অবশেষে একটি তামিল-কন্যা ভাবে বিভোর হয়ে সুমধুর কণ্ঠে

গান করলেন। মাতৃবন্দনা সঙ্গীত। আকুলতাপূর্ণ অপূর্ব ছিল সে সঙ্গীত।

অরুণাচলম্ থেকে মা এলেন কুম্ভকোনম্। কাবেরী নদীর তীরে হরি ওঁ আশ্রমে মা ভক্তবৃন্দসহ এসে উঠলেন। বেশ শান্ত পরিবেশের মধ্যে আশ্রমটি। কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী কাবেরী।

কুম্ভকোনম্ দাক্ষিণাত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান। প্রবাদ আছে যে মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত বিশ্ব জলময় হয়ে গেলে একটি অমৃতের কুণ্ডমাত্র ভাসতে থাকে। ভাসতে ভাসতে এই স্থানে এসে ঠেকে। পরে মহাদেব কিরাতরূপ ধারণ করে এখানে আসেন এবং বাণ দ্বারা সেই কলসীর একটি কোণ ছিদ্র করে দেন। তখন কলসী হতে কিছু অমৃত এখানে পড়ে। এই জন্যেই এ স্থানের নাম হয়েছে কুম্ভকোনম্।

মা এখানে এসে দর্শন করলেন প্রসিদ্ধ শার্ঙ্গপাণি মন্দির। অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুমূর্তি। এবং কুম্ভেশ্বর শিব মন্দির।

তারপর মায়াভরমে বিষ্ণু মন্দির। শিব মন্দির ও শক্তি মন্দির দর্শন করে মা এলেন তাঞ্জোরে। মন্দির নগর তাঞ্জোরে। ছোট বড় অসংখ্য মন্দিরে ঘেরা এই তাঞ্জোর। দাক্ষিণাত্যের গর্ব বৃহদীশ্বর মন্দির দর্শন করে শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ এলেন শ্রীরঙ্গমে। শ্রীরঙ্গমে এসে মা দর্শন করলেন শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথকে। এবং অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর আদি মূর্তি। বিশাল মন্দির। অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মূর্তি ও বিশাল শ্রীরঙ্গমের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের গৌরব। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখানে চার মাস ছিলেন। চাতুর্মাস্য এখানেই করেছিলেন।

ভাবচক্ষে—স্বয়ং বিষ্ণুকে নয়নগোচর করে শ্রীশ্রীমা ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়ে অপরূপ জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে হলেন প্রতিভাত ভক্তগণের সম্মুখে। মায়ের এই ভাবময়ী মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তরা মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

প্রবাদ আছে যে রাবণ বধের পর যখন শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসছিলেন বিভীষণাদি সকলেই সঙ্গে ছিলেন। পরে বিভীষণকে লঙ্কায় ফিরবার আদেশ দিলে বিভীষণ খুব কাঁদতে থাকেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে শ্রীরঙ্গমের মূর্তি দিয়ে বললেন ঐ মূর্তি নিয়ে লঙ্কায় ফিরে যেতে। বিভীষণ পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পেলেন। গণেশজী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসে তাঁকে মূর্তির বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। বিভীষণ সব কিছু বলে তাঁর হাতে মূর্তিটি রেখে একটু অন্য দিকে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মূর্তিটিকে মাটির উপর রেখে ভাল করে দেখছেন। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলেছিলেন সে মূর্তি যেন পথে না রাখা হয়, তবে তিনি সেইখানেই থেকে যাবেন। শর্তভঙ্গ হয়েছে দেখে বিভীষণ ক্রোধান্ধ হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে আঘাত করলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রাহ্মণবেশধারী ছিলেন স্বয়ং গণেশজী। তিনি আত্মপ্রকাশ করলে বিভীষণ বিশেষ অনুতপ্ত হলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিভীষণ পরে সেই স্থানেই শ্রীরঙ্গনাথের মূর্তি স্থাপনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গণেশজীর মূর্তিও করলেন স্থাপন।

শ্রীরঙ্গম থেকে মা এলেন রামেশ্বরম্। রামেশ্বরম্ থেকে ধনুষ্কোডিতে। ধনুষ্কোডিতে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর মিলিত হয়েছে। সমুদ্র এখানে শান্ত নীরব। যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে। শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দসহ এখানে স্নান করলেন।

অবশেষে ধনুষ্কোডি থেকে আবার ফিরে এলেন রামেশ্বরম্-এ। তারপর রামেশ্বরম্ থেকে যাত্রা করলেন মাদুরার পথে। মাদুরায় এসে মা ভক্তবৃন্দসহ প্রবেশ করলেন মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। মন্দিরের ব্রাহ্মণগণ মালাচন্দন ও ফুল দিয়ে আনন্দময়ী মাকে অভ্যর্থনা করলেন। দলে দলে ভক্তরা এসে শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। যেন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং এসে আবির্ভূতা হয়েছেন মন্দিরে। ক্রমে ক্রমে দশ সহস্র লোক

একত্রিত হলেন আনন্দময়ী মা'র মুখনিঃসৃত অমৃত-নিষ্যন্দিনী বাণী শুনবার আশায়।

শ্রীশ্রীহরিবাবার কীর্তনের পর শ্রীশ্রীমা 'হে ভগবান্, হে ভগবান্' বলে সুমিষ্ট কণ্ঠে গান ধরলেন। মায়ের কণ্ঠনিঃসৃত দিব্য সঙ্গীত শ্রবণ করে সকলেই তৃপ্ত হলেন। সঙ্গীত শেষে মা ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, এই শরীরের কথা হচ্ছে 'হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। জঁহা রাম উহাঁহী আরাম। জঁহা নহী রাম উহাঁহী বে-আরাম—ব্যারাম।' একজন ভক্ত তামিল ভাষায় মায়ের কথার মর্মার্থ বলে দিলেন। সকলেই তৃপ্ত হয়ে মাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

মাতুরাকে পিছনে ফেলে মা এলেন ত্রিচুরীতে, মহর্ষি রমণের জন্মস্থানে। এখানেও কয়েক সহস্র লোক এসে মিলিত হলেন মা আনন্দময়ীকে দর্শন করবার অভিলাষে।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে এবং মায়ের মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করে সকলেই মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন।

ত্রিচুরী থেকে মা এলেন পালনীতে। পালনীতে এসে মা দর্শন করলেন কার্তিকের মন্দির। স্থানটি পাহাড়ের উপর। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম।

এই ভাবে দক্ষিণের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করে মন্দিরাদি দর্শন করে মা এলেন কন্যাকুমারিকাতে। কন্যাকুমারিকা থেকে এলেন ত্রিবান্দ্রম্। ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী হলো ত্রিবান্দ্রম্। প্রাকৃতিক শোভা অবর্ণনীয়। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করে মাকে নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে। রাজপরিবারের সকলেই ভক্তিভরে প্রণাম করে শ্রীশ্রীমাকে মীনাক্ষী দেবীরূপে পূজা ও আরতি করলেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য।

পদ্মনাভের মন্দির দর্শন করে শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ করলেন স্বামী রামদাসের সঙ্গে। তিনি এই অঞ্চলের অতি প্রসিদ্ধ সাধু।

ভরকলইতে এসে মা দর্শন করলেন জনার্দন মন্দির জনার্দন মন্দির দর্শন করে মা এলেন রমা মা'র আশ্রমে। রমা মা মস্ত বড় সাধিকা। শিষ্যবর্গ সহ কীর্তন করতে করতে রমা মা, আনন্দময়ী মাকে নিজে আশ্রমে নিয়ে এলেন। রমাদেবীর আশ্রমে লীলা করে, শ্রীশ্রীমা যাত্রা করলেন কালাডির পথে। কালাডিতে মা দর্শন করলেন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান। তারপর কালাডি থেকে এলেন কোয়েম্বাটুরে। এখানে সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র বসু সপরিবারে এসে মাকে প্রণাম করলেন। এখানে এসে মা দর্শন করলেন গণপতির মন্দির, শিবের মন্দির, পার্বতীর মন্দির আর নবগ্রহের মন্দির। মা মন্দিরে পৌঁছতেই বাজনা বেজে উঠলো। ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করতে করতে রূপার পূর্ণ কুম্ভ শ্রীশ্রীমা'র হাতে দিলেন। অভাবনীয় অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। অবশেষে মা এলেন সাঁইবাবার আশ্রমে। আশ্রমটির প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম। সাঁইবাবা এই অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা মহাত্মা ছিলেন।

কোয়েম্বাটুর থেকে ভক্তবৃন্দসহ মা এলেন মহীশূর রাজ্যে। মহীশূরে এসে উঠলেন মহারাজার অতিথিশালায়। মহারাজা সপরিবারে এসে মাকে দর্শন করলেন। সকলেই মাকে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। বৈকালে মহারাণী নিজে এসে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে গেলেন চামুণ্ডা মন্দিরে। পাহাড়ের উপর মন্দিরটি সৌন্দর্যমণ্ডিত। মন্দিরে অষ্টভুজা দেবী মহিষমর্দিনী। মূর্তিটিও অপূর্ব। পাহাড়ের উপর মন্দিরটির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীশ্রীমা ভগবৎপ্রেমে ডুবে গেলেন। ব্রহ্মানন্দে বিভোর হলেন।

এবারে মা এলেন বৃন্দাবনে। মহীশূরের বৃন্দাবন। প্রসিদ্ধ স্থান। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পূজিত হয়। শত শত দক্ষিণী মানুষের মেলায় মুখর হয়ে ওঠে দক্ষিণের এই বৃন্দাবন ধাম। আজ মা আনন্দময়ী পদার্পণ করলেন পরম পবিত্র ভগবৎ প্রেমের সেই লীলাভূমিতে। লীলায় ছাওয়া বৃন্দাবনে।

বাঙ্গালোর।

'আনন্দময়ী মা' এসেছেন বাঙ্গালোরে। প্লাবিত হয়ে উঠেছে সমস্ত শহর। মেয়র, মিনিস্টার, সাধারণ অসাধারণ সব রকমের মানুষ মিলিত হয়েছেন স্থানীয় টাউন হলে। মা আনন্দময়ীকে দর্শন করবেন এবং তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃত-নিষ্যন্দিনী বাণী শুনবেন সেই আশায়।

ফুল-মালায় বিভূষিত হয়ে মা অপরূপ এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে হলেন প্রতিভাত জনগণের সম্মুখে। সকলের একান্ত প্রার্থনায় মা বলছেন, 'এই শরীরটার ত সব সময় কথা বলা আসে না। কোনও কোনও সময় উল্টাপাল্টা কিছু কিছু হয়ে যায়।

এই শরীরটা সর্বদাই বলে যে ছোট ছোট বাচ্চারা এই শরীরের দোস্ত। আর দোস্তদের পিতামাতা এই শরীরেরও পিতামাতা। তাদের বলা হয়—'দেখ হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। হরি মানে যিনি দুঃখ হরণ করেন অর্থাৎ যা অমৃতবান। অমৃতবান মানে অমরবান। যাহা অমৃত লাভের পথে নিয়া যায়। সেই হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।'

আবার বলছেন, সংসারে থাকলে ধর্মলাভ হয় না। এ কথা সত্য নয়। গার্হস্থ্য জীবনের ভিতর দিয়ে ধর্মলাভের কত সুযোগ! পিতামাতার স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর অনুরাগ, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, পুত্রকন্যার ভক্তিশ্রদ্ধা, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাসা, আশ্রিত ও দীনদুঃখীর আশীর্বাদ ইত্যাদি ধর্মজীবনের কত সহায়—একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।

সংসারের সুখ-দুঃখের আন্দোলনে মনটিতে ঘষামাজা পড়লে কখনো কখনো মানুষকে ত্যাগময় করে, ভগবানের জন্য জাগায় আকুলতা। সে অবস্থার সুযোগ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরাও অনেক সময় লাভ করতে পারেন না।

সন্ন্যাসী কে?

সন্ন্যাসী বলে তাকে যার সদা শূন্যে বাস। যে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ

করে আর নিত্য অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছে মাত্র।

তাঁর নামে যার সব শূন্যে ভেসে গেছে সেই সন্ন্যাসী। যতক্ষণ ঘর বাড়ি, ট্যাঁকে পয়সা, শরীরের আরাম, মনে ভোগ বাসনা প্রশংসা ইত্যাদির জন্য আগ্রহ থাকবে ততক্ষণ গৃহে থাকাই নিতান্ত উচিত। এ পথের পথিক একেই তো কম। যারা সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয় তারা যদি সকল রকমে নিঃস্বার্থপর হয়ে না চলে অথবা বিহিত আচারে আচারবান না হয়, তা হলে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সন্ন্যাসীর ভাব নিয়ে গৃহী হওয়া যতদূর প্রশংসার বিষয়, সন্ন্যাসী না হয়ে সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে বের হওয়া তার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধের কথা। এতে শুধু যে নিজের ক্ষতি হয় এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের পবিত্র আদর্শকেও ছোট করা হয়। তাইতো বলি, সংসার ছেড়ে বনে যাবার প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকেই ধর্মলাভ করতে চেষ্টা করো।

শুদ্ধ ভাবে কর্ম করো। হাতে কাজ মনে তাঁরই চিন্তা। কাজ করো। কাজের সঙ্গে সঙ্গেই নাম। তিনি কর্মের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হবেন। চন্দ্র সূর্যের আলোর মত প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে কেমন করে তিনি সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন।'

সকলেই তৃপ্ত হলেন শ্রীশ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত অমৃত-নিষ্যন্দিনী বাণী শুনে। কথাগুলি মা বললেন হেসে হেসে মিষ্টি করে বাংলা ভাষায়। দোভাষীর কাজ করলেন বাঙ্গালোরের ভক্ত শ্রীযুত অরবিন্দ বসু। মায়ের পুরানো ভক্ত মহীশূর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্তও মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। আর অভিভূত হলেন দক্ষিণের খ্যাতনামা অখ্যাতনামা মানুষেরা।

আনন্দময়ী মা শুধুমাত্র যোগিনী সন্ন্যাসিনী নন, সুবক্তাও বটেন।

বাঙ্গালোরে চারদিন অবস্থান করে মা মিরাজ হয়ে পাণ্ডবপুরের পথে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবপুরে এসে মা দর্শন করলেন বিঠ্ঠলদেবকে। বিঠ্ঠল দেবের মন্দির। বিঠ্ঠলদেব কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবাদ আছে, এই বিগ্রহ দর্শন করলে দর্শনকারীর বিষয়-বাসনা কোমরের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না।

বিঠ্ বাংলা অর্থ ইট। ভগবান শ্রীবিষ্ণু ইটের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন ভক্তের প্রতীক্ষায় তাই নাম হয়েছে বিঠ্ঠলদেব।

ভগবান ভক্তের কাছে বাঁধা। জ্ঞান দিয়ে হবে না, মস্তিষ্ক দিয়ে হবে না, হবে হৃদয় দিয়ে। সরল বিশ্বাসে সংশয় না রেখে শুধু সেবা করে যাওয়া। হৃদয় দিয়ে সেবা। তাহলেই পরমার্থ লাভ হবে। স্বয়ং ভগবান সত্যস্বরূপে দেখা দেবেন। এমনই সেবাপরায়ণ ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গৃহস্থ মানুষ। সংসারও করছে কিন্তু ভগবানে সরল বিশ্বাস। সেবাই তার পরমধর্ম। সেবাতেই সে তৃপ্ত। গৃহে বৃদ্ধ পিতামাতাকে সেবা না করে সে জলগ্রহণও করে না। পিতামাতার আহারের পর বিশ্রাম গ্রহণ করলে সে নিজে আহার করে। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। শ্রীবিষ্ণুর আসন টললো। তিনি ভক্তের একাগ্রতা পরীক্ষা করবার মানসে, মনুষ্য মূর্তিধারণ করে ব্রাহ্মণের বাড়ির সম্মুখে এসে ভিক্ষা চাইলেন। ঠিক সেই সময় ব্রাহ্মণ তার পিতামাতার সেবায় ব্যস্ত ছিল। সুতরাং পিতামাতার আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে সে বাইরে এলো। অনেকক্ষণ পর। এসে দেখলো ভিক্ষুক নয়, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু তার ঘরের পাশে পড়ে থাকা ইটের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভগবান তার একাগ্র চিত্তের সেবাপরায়ণতা দর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগের কথাই ভুলে গেছেন। এমন সেবাপরায়ণ ভক্তটিকে একবার দর্শন না করে যাবেন না।

এদিকে স্বয়ং বিষ্ণুকে দর্শন করে ভক্ত ব্রাহ্মণ অভিভূত হয়ে চেতনা হারিয়ে ফেললো। জ্ঞান হলে সে বললো আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার কথা। লোকমুখে প্রচারিত হলো এই অভাবনীয় অনির্বচনীয়

কাহিনী। সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠা হলো শ্রীবিষ্ণুর মন্দির। শ্রীবিষ্ণু নয়—ইটের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তাই—বিঠ্ঠলদেব। বিঠ্ঠলদেবের মন্দির।

. মন্দিরের পূজারী অভ্যর্থনা করে শ্রীশ্রীমাকে মন্দিরাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। এবং মূর্তি স্পর্শ করবার জন্য মাকে অনুরোধ করলেন। মহানন্দে মা স্পর্শ করলেন বিগ্রহকে। বিঠ্ঠলদেবের সর্ব অঙ্গে দিলেন হাত বুলিয়ে। গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। শ্রীশ্রীমা ভাবানন্দে বিভোর হয়ে অপরূপ জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে হলেন প্রতিভাত। পূজারী ও ভক্তবৃন্দ নয়নমনহরা সে মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন।

* * *

অবশেষে মা আনন্দময়ী ভক্তবৃন্দ ও মহাত্মাগণসহ পুণা হয়ে বম্বেতে এসে উপস্থিত হলেন। এসে উঠলেন ভিলে পার্লে সন্ন্যাস আশ্রমে। কৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মায়ের জন্য সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। আশ্রমটি মনোরম। স্বামী মহেশ্বরানন্দজী মহারাজ এখানকার মহামণ্ডলেশ্বর। মন্দিরে আছে, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিব ও বিষ্ণু এবং শঙ্করাচার্যের মূর্তি।

এইভাবে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণের লীলা সাঙ্গ করে পশ্চিম ভারতের পথে যাত্রা করলেন। দ্বারকাধীশের দর্শন অভিলাষে দ্বারকার পথে যাত্রা হলো শুরু। পথের পর পথ পিছনে ফেলে মা সম্মুখের পথে এগিয়ে চললেন।

তখনও যেন দক্ষিণের ভক্তরা বলছে, হে মাতঃ! তোমার স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য প্রসারিত করো। আনন্দদায়িনী মা আনন্দময়ী তুমি নিরন্তর যে আনন্দসুধা বর্ষণ করছো সেই আনন্দসুধা দিয়ে আমাদের হৃদয়-কুম্ভটি পরিপূর্ণ করে দাও!

আনন্দময়ী মা'র কানে তখনও যেন ভেসে আসছে তামিল-কন্যার কণ্ঠনিঃসৃত আকুলতা-পূর্ণ সেই সুললিত সঙ্গীত,—

প্রেমময়ী মাঈ

আনন্দময়ী মাঈ

অতি অদ্ভুত মধুরময়ী মাতা

মাঈ মাঈ মাঈ—॥

বত্রিশ

দ্বারকা।

রুক্মিনী প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরিক লীলাস্থল।

দ্বারকাধীশকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে মা আবার এসে উপস্থিত হলেন দ্বারকাতে। পূর্ণিমা তিথিতে। লীলাময়ী মায়ের মাধুর্যময় লীলারও নেই শেষ। পথ চলারও নেই বিরাম। কি বিচিত্র পথ-পরিক্রমা!

ভারত-পথিক আনন্দময়ী মা!

ভারতের বিশাল জনপদ, বিপুল জনতার মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষা দিতে দিতে সারা ভারত পরিক্রমা করে চলেছেন। নিরাভরণা তপস্বিনীর বেশ, মুখে কৃষ্ণ নাম।

পূর্ণিমা নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্নালোকে মা দর্শন করলেন দ্বারকানাথকে দ্বারকাধীশ রুক্মিনী-প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীশ্রীহরিবাবা হরিসংকীর্তনে মুখরিত করে তুললেন দ্বারকাধীশের মন্দির-দ্বার। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। মায়ের হলো ভাবাবেশ। ভাবানন্দে বিভোর হলেন আনন্দময়ী মা।

ভাবে ঢল-ঢল। যেন সেই অচিন্ত্য মধুর রসে মগ্ন হয়ে আছেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দরের মত প্রাণজুড়ানো কৃষ্ণনামে মেতে উঠলেন। নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। সেই ভাবপূর্ণ মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন মন্দিরের পূজারী আর উপস্থিত ভক্তজনেরা।

দ্বারকায় এসে মা দর্শন করলেন রুক্মিণী দেবীর মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আর দামোদর কুণ্ড।

মা মন্দির দর্শন করবেন কি! মাকে দর্শন করতেই অসংখ্য লোকের সমাবেশ হচ্ছে। মা যে-স্থানেই পদার্পণ করছেন সেইখানেই দর্শনার্থীর ভিড়।

মা কোথাও অজ্ঞাত ভাবেও থাকতে পারছেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে আনন্দময়ী মার আগমন সংবাদ। মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূতা হয়েছেন স্বয়ং শ্রীরাধারাণী। রুক্মিণী-প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেমময় তৃষ্ণায় ছুটে এসেছেন মুরলীধর শ্যাম-সুন্দরের শ্রীরাধারাণী। ব্রজ হতে। শ্রীবৃন্দাবন ধাম হতে। কে দেখবি আয়! ব্যথিত তাপিত অন্তরে কে শুনবি আয় মধুমাখা কৃষ্ণনাম!

সৎসঙ্গের ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীশ্রীমাকে ঘিরে এ আয়োজন। দ্বারকাবাসীরা আজ শুনবেন আনন্দময়ী মা'র মুখনিঃসৃত অমিয় অমৃত-নিষ্যন্দিনী বাণী। সকলের একান্ত প্রার্থনায় মা বলছেন, অরুণোদয়ে বৈরাগী এসে ঘরে ঘরে হরিনাম করে গেল, শুনলো হাজার লোক, কিন্তু মনে রইল কয়জনার? এর কারণ কি? কান ত সকলেরই আছে। তবে আপাত-মনোরম সংসারের সুরগুলি অধিকাংশ লোকের এমন ভাল লেগে গেছে যে ধর্মের সুর সহজে তাদের কানে বাজে না। এর একমাত্র প্রতিবিধান এই যে, প্রত্যহ হরি বা যে কোন ঈশ্বর বাচক নাম জপ করতে হবে। দশটি হোক আর দশ হাজার হোক। তা না হ'লে প্রত্যহ কিছুকাল উপাসনা বা আত্ম-বিচার, সাধুসঙ্গ সদালাপ প্রভৃতিতে কাটাতে হবে। এরূপে ক্রমে ক্রমে দেহ-যন্ত্রটি ধর্মসঙ্গীত গ্রহণ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হবে। প্রত্যহ মনোযোগ না দিলে যেমন কোন বিদ্যাই অর্জন হয় না, আত্মতত্ত্বও তদ্রূপ সাধনার বিষয়,—এই ধারণা রাখা আবশ্যক। ঘড়িতে দম দেওয়ার মত, মনের কলে ভগবদ্ ভাবের চাবিটি অন্তত দিনে একবার ঘুরিয়ে নিলেও চিত্তশুদ্ধির অনেক সহায়তা হয়।

আবার বলছেন, ভাঙাগড়া কালের গতি, কালের উপর যিনি মহাকালরূপে বসে আছেন তিনি অখণ্ডরূপে পূর্ণ, খণ্ডরূপেও পূর্ণ। এই কারণে ভাঙাগড়া তাঁর সর্বত্র সমান, এই সমদর্শিতার জন্য তিনি মঙ্গলময়, এবং সুখী দুঃখী সকলেরই প্রার্থনার বস্তু। না গড়লে ভাঙে না এবং না ভাঙলেও গড়ে না। কাজেই জগৎচক্রে ভাঙাগড়া অনিবার্য। সীমার গণ্ডিতে থেকে কয়েদীর মত তোমরা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছ। এ জন্যই 'আমি' ও 'আমার' এই দু'কথার বাইরে যেতে পারো না। পুত্রলাভ করে হাসো আবার পুত্র হারিয়ে কাঁদো। রক্তমাংসের দ্বন্দ্ব ভুলে ক্ষণিক ফিরে দাঁড়ালেই দেখা যায় কে-ই বা কার পুত্র? কে-ই বা কার পিতা? অথবা পিতা পুত্র বলে কিছুই নেই। একমাত্র তিনিই সর্বভাবে সর্বত্র মূর্তিমান।

তাইতো বলি,—'হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।'

মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করে উপস্থিত মহাত্মারা ও ভক্তজনেরা তৃপ্ত হলেন।

এই ভাবে শ্রীশ্রীমা দ্বারকার লীলা সাঙ্গ করে চলে এলেন রাজকোটে। রাজকোট থেকে এলেন মোরভি। মোরভির বৃদ্ধ মহারাজার একান্ত প্রার্থনায় রাজপ্রাসাদে এলেন। মহারাজা ও মহারাণী পুত্রশোকে কাতর। অল্প কিছুদিন হলো পুত্র ইহধাম পরিত্যাগ করেছেন। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে এবং মায়ের মুখনিঃসৃত তৃপ্তিময় ভাষার কথামৃত পান করে রাজপরিবারের সকলেই সান্ত্বনা পেলেন। মোরভি থেকে এলেন ভাবনগরে। ভক্ত জয়ন্তীলাল শ্রীশ্রীমা ও মহাত্মাদের থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। এখানেও অসংখ্য দর্শনার্থীর ভিড়। ভক্তদের একান্ত আগ্রহে ভাবনগরে তিন দিন অবস্থান করে, আমেদাবাদের পথে যাত্রা করলেন। ভিরাম্‌গাম স্টেশনে অগণিত দর্শনার্থীর ভিড় হলো। এবং তাদের একান্ত প্রার্থনায় মা অবতরণ করলেন। ভক্ত কান্তিভাই মুন্‌শী কুন্দনবেন, লীলাবেন, মুকুন্দভাই আরও অন্যান্যরা সাদরে অভ্যর্থনা করে মাকে নিয়ে

গেলেন। ভক্তপ্রবর কান্তিভাইয়ের পূজার ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের থাকবার ব্যবস্থা হলো।

অমেয় সৌভাগ্যবান ভক্তপ্রবর কান্তিভাইয়ের গৃহ পুণ্যময় হয়ে উঠলো শ্রীশ্রীমা ও মহাত্মাদের অবস্থানে। কৃষ্ণগুণগানে। এইভাবে অধিক রাত্রি পর্যন্ত ভক্তরা মেতে রইলো আনন্দ-কীর্তনে।

আবার সেই অন্ধকার রাত্রিরও হলো অবসান। ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো ঊষার আলো। সূর্যদেব উদ্দিত হলেন। ভোরের বেলা স্নিগ্ধ বাতাস ঝির ঝির করে বইতে লাগলো। শ্রীশ্রীমায়ের গৃহ হতে বাতাস বয়ে নিয়ে এলো মাতৃকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত।

রাধিকারঞ্জন গিরিবরধারী।
রাধিকারঞ্জন গোলোকধারী॥
রাধিকারঞ্জন শ্রীমধুসূদন।
রাধিকারঞ্জন মদনমোহন॥
রাধিকারঞ্জন বাঁকে বিহারী।
রাধিকারঞ্জন কৃষ্ণ কুমারী॥

সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব সে সঙ্গীত! দিব্য সঙ্গীত!

অবশেষে—

আমেদাবাদের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে, মন্দিরাদি আশ্রম দর্শন করে শ্রীশ্রীমা যাত্রা করলেন চান্দোদের পথে। চান্দোদে পেঁছালে ভক্তবৃন্দ কীর্তন করতে করতে মাকে আশ্রম অভিমুখে নিয়ে চললেন। যেন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দসহ কীর্তন করতে করতে নীলাচলের পথে যাত্রা করছেন। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। চান্দোদ আশ্রমের বৃদ্ধ মোহন্তজী মা আনন্দময়ীর ভক্ত এবং অনুরক্ত। রাজপিপ্‌লার ভক্তরা এসে শ্রীশ্রীমাকে ভীমপুরার আশ্রমে নিয়ে গেলেন। মহামহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো আশ্রম। দলে দলে ভক্তরা এসে মায়ের চরণধূলি মাথায় নিয়ে আর শ্রীমুখের কথামৃত পাম করে তৃপ্ত হলেন। মা ভক্তবৃন্দসহ তিন দিন অবস্থান করলেন।

তারপর প্রাণহরা মা সকলের প্রাণ হরণ করে নিয়ে আবার পথে বের হয়ে পড়লেন। যাত্রা হলো শুরু। চান্দোদ স্টেশনে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলো এক নাপিত। ভাবে গদগদ। মায়ের জন্য আকুলতায় তার দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে। সে মায়ের কৃপাপ্রার্থী। শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করে নখ কাটবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলো। মা সবকিছু শুনে মৃদু হেসে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। কৃপাময়ী করুণাময়ী মা সকলকেই সমানভাবে কৃপা করেন। ধনী দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, সৎ, অসৎ সকলের উপরেই মায়ের কৃপা সমভাবে হচ্ছে বর্ষিত। মা যে জগজ্জননী! সকলেরই মা। বিশ্বজননী আনন্দময়ী মা !

মহানন্দে নাপিতটি শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলের নখ কাটতে কাটতে গান ধরলো। ব্যাকুলতাপূর্ণ মধুর সে সঙ্গীত। গান গাইছে আর দুই চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরে পড়ছে।

রুখ্ না সকো তো যাও মা তুম যাও।
এক মগর হাম সব কী হ্যায় ফরিয়াদ,
কভী হমারী ভী কর লো ইয়াদ।
হাম তো তুম্হে ন ভুল সকেঙ্গে,
তুম চাহে তো বিখরাও। মা তুম্ যাও।
রুখ্ না সকো তো যাও, মা তুম্ যাও।
যানে কে তো মিলে পুরানী মাঈয়া
না জানে কভ্ মিলে আনন্দী মাঈয়া।
আজ ভী ছোড়নেকে পহলে
তুম একবার মুসকায়ো।
মা তুম্ যাও।
রুখ্ না সকো তো যাও......।

আকুলতাপূর্ণ এ সঙ্গীত শুনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী অভিভূত হলেন। সকলেই ভাবলেন লীলাময়ী মায়ের এ আবার কি লীলা! মা স্নিগ্ধ

হাসি হেসে আশীর্বাদ করলেন. ভক্ত নাপিতটিকে, উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে। অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। মধুর মায়ের মধুর লীলা!

চান্দোদ থেকে শ্রীশ্রীমা এলেন বরোদাতে। বরোদাতে ভক্তসনে লীলা করে চলে এলেন পেটলাদে। ভক্তপ্রবর শ্রীরমনলাল শেঠের একান্ত প্রার্থনায়। তিনি সাধুদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই আশ্রমে মায়ের পদধূলি দিতে হবে তাই তাঁর এত আগ্রহ। স্থানটি সুন্দর। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। মণ্ডলেশ্বরদের মধ্যে অনেকেই এখানে এসে চাতুর্মাস্য ব্রত করেন। ঘুরে ঘুরে সবকিছু মাকে দেখালেন শেঠজী। শেঠজীও মায়ের কৃপালাভ করে শুদ্ধভাবে জীবন যাপন করছেন। মায়ের উপস্থিতিতে ভক্ত রমনলাল নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতে লাগলেন। পেটলাদ থেকে মা এলেন ডাকোরে। ডাকোর এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ডাকোরের লীলা সাঙ্গ করে শ্রীশ্রীমা যাত্রা করলেন পূর্ব ভারত অভিমুখে।

আর এই চান্দোদ থেকেই শ্রীশ্রীহরিবাবা যাত্রা করলেন ওঁকারেশ্বরের পথে। আর অবধূতজী আনন্দময়ী আশ্রমের সন্ন্যাসী শিবানন্দসহ যাত্রা করলেন রাজপুতানার নাথদ্বারা'র পথে। অবধূতজী হলেন স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূত, পাঞ্জাবের বিশিষ্ট বৈদান্তিক সাধু, শ্রীশ্রীমা'র পরম ভক্ত। আর স্বামী শিবানন্দ হলেন ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্রের মত একজন কবি এবং সঙ্গীত-রচয়িতা। মাতৃভাবে বিভোর হয়ে কবিতা রচনা করেন। অসংখ্য কবিতা রচনা করে শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে উৎসর্গ করেছেন। আনন্দময়ী মা'র স্নেহধন্য শিবানন্দ।

একে একে বিদায় নিলেন গুজরাটের ভক্তরা। কান্তিভাই, মুকুন্দভাই, চিনুভাই, শিষ্যারা আর আর অন্যান্য ভক্তিমতী স্ত্রীলোকেরা।

তারপর মায়ের যাত্রা হলো শুরু। এইভাবে মা আনন্দময়ী

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের লীলা সাঙ্গ করে ভক্তদের আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে যাত্রা করলেন বিন্ধ্যাচলের পথে। পথের পর পথ পিছনে ফেলে মা এগিয়ে চললেন সম্মুখের দিকে। মায়ের মুখমণ্ডল গম্ভীর, কি এক গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ। তখনও যেন বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে অন্তরের ব্যাকুলতাপূর্ণ সেই সঙ্গীতের সুললিত সুর। সঙ্গীতস্রষ্টার অনুরাগমত্ত আর্ত স্পন্দন—

মা তুম্ যাও।
রুখ্ না সকো তো যাও,
মা তুম্ যাও!
হাম তো তুম্‌হে ন ভুল সকেঙ্গে॥

তেত্রিশ

বিন্ধ্যাচল।

প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। যেন সৌন্দর্যের আনন্দলোক। আর এই আনন্দলোকে আনন্দলীলা করবার জন্য অবতীর্ণা হলেন আনন্দময়ী মা। দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারত পরিভ্রমণ করে মা এসে উপস্থিত হলেন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে। আশ্রমের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে জ্বলে উঠলো গন্ধধূপ। সুরভিত হলো বাতাস। শ্রীশ্রীমা ধ্যানস্থ হয়ে অনির্বচনীয় এক গভীরতায় ডুবে গেলেন।

শুরু হলো সংযম সপ্তাহ।

ভক্তসমাগম হয়েছে। সাধু মহাত্মাদেরও ভিড় হলো। শ্রীশ্রীহরিবাবা ও অবধূতজীও এসে উপস্থিত হলেন। যোগীভাই ডাঃ পান্নালাল, ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও একজন মোহান্তও এসেছেন।

সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত মৌন। তারপর সৎসঙ্গ। শ্রীশ্রীমা

সৎসঙ্গে ধ্যান ও মন্ত্র জপ সম্বন্ধে বলছেন, 'সংখ্যা রেখে জপ করাই ভাল। কারণ কে বলতে পারে কোন্ সংখ্যা পূরণ হলে তাঁর কৃপা অনুভব হবে। সংখ্যারও একটা বিশেষত্ব আছে। তবে যদি কারো এমন হয় যে মনে মনে নাম করতে করতে তার ধ্যান জমে গেছে তাঁর জন্য সংখ্যা রাখার প্রয়োজন হয় না। নতুবা হয়তো মনে মনে কেউ জপ করতে বসলো আর নিদ্রা এসে গেল। সে হয়তো টেরও পেল না। সেইজন্য সাধারণত হাতে মালা নিয়ে জপ করতে হয় ও সংখ্যা রাখতে হয়।

প্রথমে নিজ ইষ্ট মূর্তির ধ্যান করে জপ আরম্ভ করলে শেষে ঐ যে জপের অক্ষরের মূর্তিটি, তাতে মন একাগ্র হয়ে গেলে ধ্যান ত হয়েই গেল। ঐ যে মন্ত্রের অক্ষরের মূর্তি, তাও যে তাঁরই রূপ। জপ করতে করতেই মন একাগ্র হয়ে যায়। মন্ত্রের অক্ষরটিতেই মন রাখার চেষ্টা করা দরকার।'

আবার বলছেন, 'দেখ, একটা কিছু কর। হাতে একটি জপের মালা রাখ আর তা যদি না পারো অন্ততপক্ষে তোমাদের ঘড়ির টিক্‌টিকের মত নাম করে যাও। এতে বিধিনিয়ম কিছুই নেই। যত বেশী পারবে, যার যে নাম ভাল লাগে সে নামে ডাকবে। শুষ্কতা, অবসাদ আসলেও ঔষধ গেলার মত গিলবে। এরূপে সুসময়ে মনের মালার সন্ধান পাবে। তখন দেখবে যে মহাসমুদ্রের আওয়াজের মত অবিশ্রান্ত সেই মালা একমাত্র পরমপুরুষ পরমেশ্বরের গুণগান করছে। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে সর্বত্র সে ধ্বনিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেই বলে নামময় হওয়া। নামরূপ নিয়ে জগৎ। নামেই এর আরম্ভ আবার নামেই এর শেষ। নামে যখন পূর্ণ সিদ্ধি এসে সাধককে আত্মহারা করে ফেলে, তখন তার জগৎ থাকে না, 'আমি'ও চলে যায়, কি যে আছে, কি যে নেই কেউ বুঝলেও ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারে না।'

ভক্তরা তৃপ্ত হলেন মায়ের মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করে। এই

আর ধর্মপথে লোক এক-কে একই রেখে এক তত্ত্বের সন্ধান পায়। কাজেই উভয় পথ সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ভেবে দেখা উচিত যে এক না থাকলে শূন্যের কোন মূল্যই নেই। এ কারণে একের উপর সর্বদা বিশ্বাস ও নির্ভরতার সহিত এক লক্ষ্য রেখে চললে যে কোন অবস্থাতেই দারিদ্র্যের আশঙ্কা থাকে না।'

স্বধন লাভের জন্য স্বভাবের যে কর্মচেষ্টা তারই নাম সাধনা। কর্ম মাত্রেই সাধনা, জীব মাত্রেই সাধক। ভগবান জীবের স্বধন বলে তিনিই একমাত্র সাধনার বস্তু। সংসার ভাব যখন প্রবল থাকে তখন সকাম বা লৌকিক কর্মাদির দ্বারা সাধনা চলে, যদিও ভগবদ্‌ভাব এর ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে কেননা তিনি ভিন্ন কিছু হয় না, যে যা করুক সবই তাঁর নিকটে পৌঁছায়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সংসারীর সাধনাকে অভাবের সাধনা বলা যায়। তাতে মনস্তবুদ্ধি প্রধান হয়ে চলে এবং বাইরের কর্ম বা ভোগই এর লক্ষ্য। যতদিন দুঃখ দৈন্য লাঞ্ছনা অপমান শোকতাপ প্রভৃতির তাড়নায় মানুষ হয়রান হয়ে পড়ে, ততদিন ঐ সাধনা বেশ চলে। ইহাও এক হিসাবে স্বভাবের সাধনা। কারণ এই অভাবের প্রবাহ ধরে না চললে প্রায় স্বভাবের আবশ্যকতা জাগ্রত হয় না। মানুষ যখন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করে স্ব-ধনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার পারমার্থিক সাধনা বা নিষ্কাম কর্মের শুরু হয়। এই স্বভাবের কর্মই ত্যাগ বৈরাগ্য প্রেম প্রভৃতির ভিত্তি গড়ে তোলে। জন্ম নেবার পরই মানুষ পরধন বা তুচ্ছ ভোগে যেতে চায়। শুভকর্মাদির দ্বারা সুসময়ে যখন স্ব-ধনের স্মৃতি জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে উহা উদ্ধার করবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়। যতই এরূপে তার স্বভাবের কর্ম বেড়ে যায় ততই তার স্ব-ধনের জ্ঞান জন্মে। গৃহে আগুন লাগলে প্রায়ই যেমন ঘরখানি না পুড়িয়ে ছাড়ে না, যখন প্রকৃত সাধনা আরম্ভ হয় তখন আর তা কোনরূপে ক্ষান্ত হয় না। বরং সাধনার সংবেগ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে সাধনাকে স্বপথে দ্রুত গতিতে চালিয়ে নেয়।

প্রথমত সাধকের দেহাত্মবুদ্ধি সরে যায়। পরে বাসনা কামনা সম্পূর্ণরূপে গলে যায়। তারপরে সর্বত্র সমভাব জন্মায় এবং জীবকে দেহ ও মনের অতিরিক্ত সেই আত্মদেবের প্রত্যক্ষে উপস্থিত করে,—ইহাই সাধনার চরম উদ্দেশ্য। এক লক্ষ্য সাধনার প্রাণ—আর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ধৈর্য ইহার শক্তি।'

অবশেষে হেসে হেসে মা বলছেন উত্তর কাশীর স্বামী শঙ্করানন্দ গিরি মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভক্তপ্রবর শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার শ্রীযুত অনিল গঙ্গোপাধ্যায়কে,—সংসারে থেকেই ধর্ম করো। তবে সকল বিষয়ে একটি কেন্দ্র ঠিক রাখা চাই তা না হলে কোনও ভাবই জমে উঠতে পারে না। যার চিত্ত যত কেন্দ্রস্থ হবে, সে তত সরল, শান্ত, সুস্থ ও প্রেমময় হয়ে বিরাটের আভাস পাবে। অক্ষর মূর্তি ছবি চিহ্ন বা যে কোন শুদ্ধ বস্তুকে অন্তরের প্রতীক স্থির করে সুখে দুঃখে চিন্তার ধারা অবিশ্রান্ত তাতে লাগিয়ে রাখ তা হলে মন বার বার এধার ওধার গেলেও সেখানে এসে আবার বিশ্রাম নেবে এবং ক্রমে ক্রমে ভাব জাগ্রত হয়ে হৃদয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। কেবল 'অহং'-এর শক্তিতে 'সোহং' সত্তায় পৌঁছানো অথবা যোগাদি দ্বারা পরমাত্মার অনুভূতি লাভ করা বর্তমান যুগে সংসারীর পক্ষে কষ্টসাধ্য।

যারা ভগবৎ চরণের আশ্রয়ে সংসার করে তাদের জীবন শতশত অভাব অভিযোগের ভিতরও শান্তিপূর্ণ হয়। জগৎ যখন নিত্য গতিশীল তখন সব সুখ দুঃখ নিত্য ক্রিয়ার মত মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। ভক্তরা মায়ের মুখনিঃসৃত অমেয় অমৃত-নিষ্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হলেন। মাকে ঘিরে বসে গেছে আনন্দের বাজার। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দময় হয়ে উঠেছে জগৎসংসার। ভক্তদের প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আনন্দের স্রোত। আনন্দ···আনন্দ···আর আনন্দ। সর্ব স্থাবর-জঙ্গম একমাত্র আনন্দেই স্থাণু-চরিষ্ণু। সমস্ত অন্ধকারের অন্তরলোকে উদিত হলো

একটি তমোহারী সুপ্রভাতের সূর্য। সমস্ত মৃত্যুর কান্নাকে ছাপিয়ে কর্ণগোচর হতে লাগলো একটি নবজন্মের শঙ্খধ্বনি।

* * *

নদীর চলমান জলধারার মত মা আনন্দময়ী আবার ভেসে চললেন দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে। পথ দীর্ঘ দুর্গম উপলবন্ধুর। সমতল বঙ্গভূমিকে পিছনে ফেলে যাত্রা হলো শুরু নীলাচলের পথে। নীলাচলচন্দ্রকে দর্শনের ব্যাকুলতায়। এ যেন শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমময়ের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছেন পথে পথে শ্যামসুন্দরের অনুসন্ধানে। কৃষ্ণরূপ দর্শনের অভিলাষে। কোথা কৃষ্ণ! দেখা দাও! দেখা দাও!

সীমাহীন বিপুল নীল দেহ নিয়ে মহাসমুদ্রে বিরাজ করেছেন। উত্তুঙ্গ তরঙ্গধ্বনি। তরঙ্গধ্বনি নয় যেন কৃষ্ণকীর্তনের কলরোল। মা ভক্তবৃন্দসহ পুরীর বালুময় তীরে বসে আছেন আত্মসমাহিত হয়ে। মনে হয় কি এক গভীরতায় যেন ডুবে আছেন। অবশেষে মধুর কণ্ঠে গুন্‌গুন্‌ করে গান ধরলেন,

ভবনদী পার হবে যদি
নাম কর সার
মনরে আমার॥
হরিনামের তরী নিয়ে
চল্‌ না রে ভাই বেয়ে বেয়ে॥
গুরু যে তোর কর্ণধার (ও মন)
করে দিবেন ভবপার॥
হরিনামের তরী নিয়ে বেয়ে চল্‌ বেয়ে চল্‌
হরিনামের সারি গেয়ে ধেয়ে চল্‌ ধেয়ে চল্‌॥

আকুল হয়ে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে শ্রীশ্রীমা গান করলেন।

মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ভক্তবৃন্দ। আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো। মুখে তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। হঠাৎ আলোক-দোলায় দুলে উঠলো তাঁর অন্তর। শ্রীশ্রীমা শুনতে পেলেন

সেই মোহনবাঁশীর সুর। সুরধ্বনি নয়। দেবতার আহ্বান। সমুদ্রের উন্মাদ গর্জন. নয়। জনহীন স্তব্ধতার মধ্যে গঙ্গার কুলুকুলু রব। আর পাখীদেব কল-কাকলি। শত শত সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্য মিশ্রিত যোগিবেশধারী তুষারমণ্ডিত যে হিমালয় তারই আকর্ষণ। মহিমময় হিমালয়। ধ্যানমৌন হিমালয়। তপস্বী হিমালয়ের হাতছানি। সন্ন্যাসিনী আনন্দময়ী মা আত্মানন্দে বিভোর হয়ে আবার পথে বের হয়ে পড়লেন। যাত্রা হলো শুরু উত্তরাখণ্ডের পথে। পুরীধাম গয়া কাশী বিন্ধ্যাচলকে পিছনে ফেলে শ্রীশ্রীমা এগিয়ে চললেন সম্মুখের দিকে। ঘাট মাঠ মরুপ্রান্তর গিরিনদী আশ্রম মন্দির বাড়িঘর গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর ছাড়িয়ে পেছনে ফেলে 'আনন্দময়ী মা' চলেছেন হিমালয়ের পথে, অনন্তের পথে, চির আপনের সন্ধানে···।

পথেরও নেই শেষ—চলারও নেই বিরাম।

—সমাপ্ত—